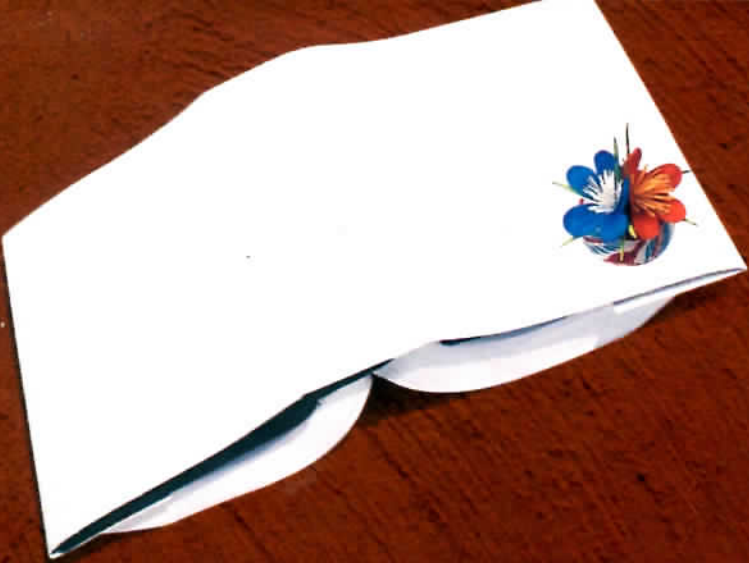

বাংলাসাহিত্যের

সেরা গল্প

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

আলোকিত মানুষ চাই

বাংলাসাহিত্যের
সেরা গল্প

সম্পাদনা
আহমাদ মোস্তফা কামাল

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ৩৫০

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
শ্রাবণ ১৪১৭ জুলাই ২০১০

প্রকাশক
সুরঞ্জিত বৈদ্য
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

মুদ্রণ
নিজাম প্রিন্টার্স এন্ড প্যাকেজেস
পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মূল্য
ষাট টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0349-6

সূচি

বলাই	৭
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
কাবুলিওয়ালা	১২
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
মহেশ	২১
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	
পুঁই মাচা	৩৩
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	
রিলিফ ওয়ার্ক্	৪৭
আবুল মনসুর আহমদ	
নয়নচারা	৫৭
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ	

বলাই

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার ভাইপো বলাই—তার প্রকৃতিতে কেমন করে গাছপালার মূল সুরগুলোই হয়েছে প্রবল। ছেলেবেলা থেকেই চুপচাপ চেয়ে চেয়ে দেখাই তার অভ্যাস, নড়ে-চড়ে বেড়ানো নয়। পুবদিকের আকাশে কালো মেঘ স্তরে স্তরে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ায়, ওর সমস্ত মনটাতে ভিজে হাওয়া যেন শ্রাবণ-অরণ্যের গন্ধ নিয়ে ঘনিয়ে ওঠে; ঝম্‌ঝম্‌ করে বৃষ্টি পড়ে, ওর সমস্ত গা যেন শুনতে পায় সেই বৃষ্টির শব্দ। ছাদের উপর বিকেলবেলাকার রোদ্‌দুর পড়ে আসে, গা খুলে বেড়ায়; সমস্ত আকাশ থেকে যেন কী-একটা সংগ্রহ করে নেয়। মাঘের শেষে আমের বোল ধরে, তার একটা নিবিড় আনন্দ জেগে ওঠে ওর রক্তের মধ্যে, একটা কিসের অব্যক্ত স্মৃতিতে, ফাল্গুনে পুষ্পিত শালবনের মতোই ওর অন্তর-প্রকৃতিটা চারদিকে বিস্তৃত হয়ে ওঠে, ভরে ওঠে, তাতে একটা ঘন রঙ লাগে। তখন ওর একলা বসে বসে আপন মনে কথা কইতে ইচ্ছে করে, যা-কিছু গল্প শুনেছে সব নিয়ে জোড়াতাড়া দিয়ে; অতি পুরানো বটের কোটরে বাসা বেঁধে আছে যে এক-জোড়া অতি পুরানো পাখি, বেঙ্গমা-বেঙ্গমী, তাদের গল্প। ঐ ড্যাবা-ড্যাবা-চোখ-মেলে সর্বদা-তাকিয়ে-থাকা ছেলেটা বেশি কথা কইতে পারে না। তাই ওকে মনে মনে অনেক বেশি ভাবতে হয়। ওকে একবার পাহাড়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমাদের বাড়ির সামনে ঘন সবুজ ঘাস পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নিচে পর্যন্ত নেবে গিয়েছে, সেইটে দেখে আর ওর মন ভারি খুশি হয়ে ওঠে। ঘাসের আস্তরণটা একটা স্থির পদার্থ তা ওর মনে হয় না; ওর বোধ হয়, যেন ঐ ঘাসের পুঞ্জ একটা গড়িয়ে-চলা খেলা, কেবলই গড়াচ্ছে; প্রায়ই তারই সেই ঢালু বেয়ে ও নিজেও গড়াত—সমস্ত দেহ দিয়ে ঘাস হয়ে উঠত—গড়াতে গড়াতে ঘাসের আগায় ওর ঘাড়ের কাছে সুড়সুড়ি লাগত আর ও খিল খিল করে হেসে উঠত।

রাত্রে বৃষ্টির পরে প্রথম সকালে সামনের পাহাড়ের শিখর দিয়ে কাঁচা সোনা-রঙের রোদ্‌দুর দেবদারুবনের উপরে এসে পড়ে—ও কাউকে না বলে আস্তে আস্তে গিয়ে সেই দেবদারুবনের নিস্তব্ধ ছায়াতলে একলা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, গা ছমছম করে—এইসব প্রকাণ্ড গাছের ভিতরকার মানুষকে ও যেন দেখতে পায়। তারা কথা কয় না, কিন্তু সমস্তই যেন জানে। তারা-সব যেন অনেক কালের দাদামশায়, 'এক যে ছিল রাজা'দের আমলের।

ওর ভাবে-ভোলা চোখটা কেবল যে উপরের দিকেই তা নয়, অনেক সময় দেখেছি, ও আমার বাগানে বেড়াচ্ছে মাটির দিকে কী খুঁজে খুঁজে। নতুন অঙ্কুরগুলো তাদের কোঁকড়ানো মাথাটুকু নিয়ে আলোতে ফুটে উঠছে এই দেখতে তার ঔৎসুক্যের সীমা নেই। প্রতিদিন ঝুঁকে পড়ে পড়ে তাদেরকে যেন জিজ্ঞাসা করে, 'তার পরে? তার পরে? তার পরে?' তারা ওর চির-অসমাপ্ত গল্প। সদ্য-গজিয়ে-ওঠা কচি কচি পাতা, তাদের সঙ্গে ওর কী যে একটা বয়স্যভাব তা ও কেমন করে প্রকাশ করবে। তারাও ওকে কী একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার জন্য আঁকুপাঁকু করে। হয়তো বলে, 'তোমার নাম কী।' হয়তো বলে, 'তোমার মা কোথায় গেল।' বলাই মনে মনে উত্তর করে, 'আমার মা তো নেই।'

কেউ গাছের ফুল তোলে এইটে ওর বড়ো বাজে। আর-কারো কাছে ওর এই সংকোচের কোনো মানে নেই, এটাও সে বুঝেছে। এইজন্যে ব্যথাটা লুকোতে চেষ্টা করে। ওর বয়সের ছেলেগুলো গাছে ঢিল মেরে মেরে আমলকী পাড়ে, ও কিছু বলতে পারে না, সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। ওর সঙ্গীরা ওকে খ্যাপাবার জন্যে বাগানের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে ছড়ি দিয়ে দু পাশের গাছগুলোকে মারতে মারতে চলে, ফস্‌ করে বকুল গাছের একটা ডাল ভেঙে নেয়—ওর কাঁদতে লজ্জা করে, পাছে সেটাকে কেউ পাগলামি মনে করে। ওর সব-চেয়ে বিপদের দিন, যেদিন ঘাসিয়াড়া ঘাস কাটতে আসে। কেননা, ঘাসের ভিতরে ভিতরে ও প্রত্যহ দেখে দেখে বেড়িয়েছে—এতটুকু-টুকু লতা, বেগনি হল্‌দে নামহারা ফুল, অতি ছোটো ছোটো; মাঝে মাঝে কণ্টিকারি গাছ, তার নীল নীল ফুলের বুকের মাঝখানটিতে ছোট্ট একটুখানি সোনার ফোঁটা; বেড়ার কাছে কাছে কোথাও বা কালমেঘের লতা, কোথাও বা অনন্তমূল; পাখিতে-খাওয়া নিম ফলের বিচি পড়ে ছোটো ছোটো চারা বেরিয়েছে, কী সুন্দর তার পাতা—সমস্তই নিষ্ঠুর নিড়ানি দিয়ে দিয়ে নিড়িয়ে ফেলা হয়। তারা বাগানের শৌখিন গাছ নয়, তাদের নালিশ শোনবার কেউ নেই।

এক-একদিন ওর কাকির কোলে এসে বসে তার গলা জড়িয়ে বলে, "ঐ ঘাসিয়াড়াকে বলো-না, আমার ঐ গাছগুলো যেন না কাটে।"

কাকি বলে, "বলাই, কী যে পাগলের মতো বকিস। ও যে সব জঙ্গল, সাফ না করলে চলবে কেন।"

বলাই অনেক দিন থেকে বুঝতে পেরেছিল, কতকগুলো ব্যথা আছে যা সম্পূর্ণ ওর একলারই—ওর চারদিকের লোকের মধ্যে তার কোনো সাড়া নেই।

এই ছেলের আসল বয়স সেই কোটি বৎসর আগেকার দিনে, যেদিন সমুদ্রের গর্ভ থেকে নতুন-জাগা পঙ্কস্তরের মধ্যে পৃথিবীর ভাবী অরণ্য আপনার জন্মের প্রথম ক্রন্দন উঠিয়েছে—সেদিন পশু নেই, পাখি নেই, জীবনের কলরব নেই, চার দিকে পাথর আর পাঁক আর জল। কালের পথে সমস্ত জীবের অগ্রগামী গাছ, সূর্যের দিকে জোড়হাত তুলে বলেছে, 'আমি থাকব, আমি বাঁচব, আমি চিরপথিক, মৃত্যুর পর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অন্তহীন প্রাণের বিকাশতীর্থে যাত্রা করব রৌদ্রে-বাদলে, দিনে-রাত্রে।' গাছের সেই রব আজও উঠছে বনে বনে, পর্বতে প্রান্তরে, তাদেরই শাখায় পত্রে ধরণীর প্রাণ বলে বলে উঠছে, 'আমি থাকব, আমি থাকব।' বিশ্বপ্রাণের মূক ধাত্রী এই গাছ নিরবচ্ছিন্ন কাল ধ'রে দ্যুলোককে দোহন করে; পৃথিবীর অমৃতভাণ্ডারের জন্যে প্রাণের তেজ, প্রাণের রস, প্রাণের লাবণ্য সঞ্চয় করে; আর উৎকণ্ঠিত প্রাণের বাণীকে অহর্নিশি আকাশে উচ্ছ্বসিত করে তোলে, 'আমি থাকব।' সেই বিশ্বপ্রাণের বাণী কেমন-একরকম করে আপনার রক্তের মধ্যে শুনতে পেয়েছিল ঐ বলাই। আমরা তাই নিয়ে খুব হেসেছিলুম।

একদিন সকালে একমনে খবরের কাগজ পড়ছি, বলাই আমাকে ব্যস্ত করে ধরে নিয়ে গেল বাগানে। এক জায়গায় একটা চারা দেখিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, "কাকা, এ গাছটা কী।"

দেখলুম একটা শিমুলগাছের চারা বাগানের খোওয়া-দেওয়া রাস্তার মাঝখানেই উঠেছে।

হায় রে, বলাই ভুল করেছিল আমাকে ডেকে নিয়ে এসে। এতটুকু যখন এর অঙ্কুর বেরিয়েছিল, শিশুর প্রথম প্রলাপটুকুর মতো, তখনই এটা বলাইয়ের চোখে পড়েছে। তারপর থেকে বলাই প্রতিদিন নিজের হাতে একটু একটু জল দিয়েছে, সকালে বিকেলে ক্রমাগতই ব্যগ্র হয়ে দেখেছে কতটুকু বাড়ল। শিমুলগাছ বাড়েও দ্রুত, কিন্তু বলাইয়ের আগ্রহের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। যখন হাত দুয়েক উঁচু হয়েছে তখন ওর পত্রসমৃদ্ধি দেখে ভাবলে এ একটা আশ্চর্য গাছ, শিশুর প্রথম বুদ্ধির আভাস দেখবামাত্র মা যেমন মনে করে আশ্চর্য শিশু। বলাই ভাবলে, আমাকেও চমৎকৃত করে দেবে।

আমি বললুম, "মালীকে বলতে হবে, এটা উপড়ে ফেলে দেবে।"

বলাই চমকে উঠল। এ কী দারুণ কথা! বললে, "না, কাকা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, উপড়ে ফেলো না।"

আমি বললুম, "কী যে বলিস তার ঠিক নেই। একেবারে রাস্তার মাঝখানে উঠেছে। বড়ো হলে চারদিকে তুলো ছড়িয়ে অস্থির করে দেবে।"

আমার সঙ্গে যখন পারলে না, এই মাতৃহীন শিশুটি গেল তার কাকির কাছে। কোলে বসে তার গলা জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললে, "কাকি, তুমি কাকাকে বারণ করে দাও, গাছটা যেন না কাটেন।"

উপায়টা ঠিক ঠাওরেছিল। ওর কাকি আমাকে ডেকে বললে, "ওগো, শুনছ। আহা, ওর গাছটা রেখে দাও।"

রেখে দিলুম। গোড়ায় বলাই না যদি দেখাত তবে হয়তো ওটা আমার লক্ষ্যই হত না। কিন্তু এখন রোজই চোখে পড়ে। বছর-খানেকের মধ্যে গাছটা নির্লজ্জের মতো মস্ত বেড়ে উঠল। বলাইয়ের এমন হল, এই গাছটার 'পরেই তার সব চেয়ে স্নেহ'।

গাছটাকে প্রতিদিনই দেখাচ্ছে নিতান্ত নির্বোধের মতো। একটা অজায়গায় এসে দাঁড়িয়ে কাউকে খাতির নেই, একেবারে খাড়া লম্বা হয়ে উঠছে। যে দেখে সেই ভাবে, এটা এখানে কী করতে। আরও দু-চারবার এর মৃত্যুদণ্ডের প্রস্তাব করা গেল। বলাইকে লোভ দেখালুম, এর বদলে খুব ভালো কতকগুলো গোলাপের চারা আনিয়ে দেব।

বললেম, "নিতান্তই শিমুলগাছই যদি তোমার পছন্দ, তবে আর-একটা চারা আনিয়ে বেড়ার ধারে পুঁতে দেব, সুন্দর দেখতে হবে।"

কিন্তু কাটবার কথা বললেই বলাই আঁতকে ওঠে, আর ওর কাকি বলে, "আহা, এমনিই কী খারাপ দেখতে হয়েছে।"

আমার বৌদিদির মৃত্যু হয়েছে যখন এই ছেলেটি তাঁর কোলে। বোধ করি সেই শোকে দাদার খেয়াল গেল, তিনি বিলেতে এঞ্জিনিয়ারিং শিখতে গেলেন। ছেলেটি আমার নিঃসন্তান ঘরে কাকির কোলেই মানুষ। বছর দশেক পরে দাদা ফিরে এসে বলাইকে বিলাতি কায়দায় শিক্ষা দেবেন বলে প্রথমে নিয়ে গেলেন সিমলেয়—তার পরে বিলেত নিয়ে যাবার কথা।

কাঁদতে কাঁদতে কাকির কোল ছেড়ে বলাই চলে গেল, আমাদের ঘর হল শূন্য। তার পরে দু বছর যায়। ইতিমধ্যে বলাইয়ের কাকি গোপনে চোখের জল মোছেন, আর বলাইয়ের শূন্য শোবার ঘরে গিয়ে তার ছেঁড়া এক পাটি জুতো, তার রবারের ফাটা গোলা, আর জানোয়ারের গল্পওয়ালা ছবির বই নাড়েন-চাড়েন; এত দিনে এইসব চিহ্নকে ছাড়িয়ে গিয়ে বলাই অনেক বড়ো

হয়ে উঠেছে, এই কথা বসে বসে চিন্তা করেন।

কোনো এক সময়ে দেখলুম, লক্ষ্মীছাড়া শিমুলগাছটার বড়ো বাড় বেড়েছে—এত দূর অসংগত হয়ে উঠেছে যে আর প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। এক সময়ে দিলুম তাকে কেটে।

এমন সময়ে সিমলে থেকে বলাই তার কাকিকে এক চিঠি পাঠালে, "কাকি, আমার সেই শিমুলগাছের একটা ফোটোগ্রাফ পাঠিয়ে দাও।"

বিলেত যাবার পূর্বে একবার আমাদের কাছে আসবার কথা ছিল, সে আর হল না। তাই বলাই তার বন্ধুর ছবি নিয়ে যেতে চাইলে।

তার কাকি আমাকে ডেকে বললেন, "ওগো শুনছ, একজন ফোটোগ্রাফওয়ালা ডেকে আনো।"

জিজ্ঞাসা করলুম, "কেন!"

বলাইয়ের কাঁচা হাতের লেখা চিঠি আমাকে দেখতে দিলেন।

আমি বললেম, "সে গাছ তো কাটা হয়ে গেছে।"

বলাইয়ের কাকি দু দিন অন্ন গ্রহণ করলেন না, আর অনেক দিন পর্যন্ত আমার সঙ্গে একটি কথাও কন নি। বলাইয়ের বাবা ওকে তাঁর কোল থেকে নিয়ে গেল, সে যেন ওঁর নাড়ী ছিঁড়ে; আর ওর কাকা তাঁর বলাইয়ের ভালোবাসার গাছটিকে চিরকালের মতো সরিয়ে দিলে, তাতেও ওঁর যেন সমস্ত সংসারকে বাজল, তাঁর বুকের মধ্যে ক্ষত করে দিলে।

ঐ গাছ যে ছিল তাঁর বলাইয়ের প্রতিরূপ; তারই প্রাণের দোসর।

কাবুলিওয়ালা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার পাঁচ বছর বয়সের ছোট মেয়ে মিনি একদণ্ড কথা না কহিয়া থাকিতে পারে না। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ভাষা শিক্ষা করিতে সে কেবল একটি বৎসর কাল ব্যয় করিয়াছিল, তাহার পর হইতে যতক্ষণ সে জাগিয়া থাকে এক মুহূর্ত মৌনভাবে নষ্ট করে না। তাহার মা অনেক সময় ধমক দিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দেয়, কিন্তু আমি তাহা পারি না। মিনি চুপ করিয়া থাকিলে এমনি অস্বাভাবিক দেখিতে হয় যে, সে আমার বেশিক্ষণ সহ্য হয় না। এইজন্য আমার সঙ্গে তাহার কথোপকথনটা কিছু উৎসাহের সহিত চলে।

সকালবেলায় আমার নভেলের সপ্তদশ পরিচ্ছেদে হাত দিয়াছি, এমন সময় মিনি আসিয়াই আরম্ভ করিয়া দিল, "বাবা, রামদয়াল দরোয়ান কাককে কৌয়া বলছিল, সে কিচ্ছু জানে না। না?"

আমি পৃথিবীতে ভাষার বিভিন্নতা সম্বন্ধে তাহাকে জ্ঞানদান করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বেই সে দ্বিতীয় প্রসঙ্গে উপনীত হইল। "দেখ বাবা, ভোলা বলছিল, আকাশে হাতি শুঁড় দিয়ে জল ফেলে, তাই বৃষ্টি হয়। মা গো, ভোলা এত মিছিমিছি বকতে পারে! কেবলই বকে, দিনরাত বকে।"

এ সম্বন্ধে আমার মতামতের জন্য কিছুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, "বাবা, মা তোমার কে হয়।"

মনে মনে কহিলাম শ্যালিকা; মুখে কহিলাম, "মিনি, তুই ভোলার সঙ্গে খেলা কর্‌গে যা। আমার এখন কাজ আছে।"

সে তখন আমার লিখিবার টেবিলের পার্শ্বে আমার পায়ের কাছে বসিয়া নিজের দুই হাঁটু এবং হাত লইয়া অতি দ্রুত উচ্চারণে 'আগডুম-বাগডুম' খেলিতে আরম্ভ করিয়া দিল। আমার সপ্তদশ পরিচ্ছেদে প্রতাপসিংহ তখন কাঞ্চনমালাকে লইয়া অন্ধকার রাত্রে কারাগারের উচ্চ বাতায়ন হইতে নিম্নবর্তী

নদীর জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছেন।

আমার ঘর পথের ধারে। হঠাৎ মিনি আগড়ুম-বাগড়ুম খেলা রাখিয়া জানালার ধারে ছুটিয়া গেল এবং চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, "কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা।"

ময়লা ঢিলা কাপড় পরা, পাগড়ি মাথায়, ঝুলি ঘাড়ে, হাতে গোটা দুই-চার আঙুরের বাক্স, এক লম্বা কাবুলিওয়ালা মৃদুমন্দ গমনে পথ দিয়া যাইতেছিল,—তাহাকে দেখিয়া আমার কন্যারত্নের কিরূপ ভাবোদয় হইল বলা শক্ত, তাহাকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়া দিল। আমি ভাবিলাম, এখনই ঝুলি ঘাড়ে একটা আপদ আসিয়া উপস্থিত হইবে, আমার সপ্তদশ পরিচ্ছেদ আর শেষ হইবে না।

কিন্তু মিনির চীৎকারে যেমনি কাবুলিওয়ালা হাসিয়া মুখ ফিরাইল এবং আমাদের বাড়ির দিকে আসিতে লাগিল, অমনি সে ঊর্ধ্বশ্বাসে অন্তঃপুরে দৌড় দিল, তাহার আর চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল না। তাহার মনের মধ্যে একটা অন্ধ বিশ্বাসের মতো ছিল যে, ঐ ঝুলিটার ভিতর সন্ধান করিলে তাহার মতো দুটো-চারটে জীবিত মানবসন্তান পাওয়া যাইতে পারে।

এদিকে কাবুলিওয়ালা আসিয়া সহাস্যে আমাকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল—আমি ভাবিলাম, যদিচ প্রতাপসিংহ এবং কাঞ্চনমালার অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপন্ন, তথাপি লোকটাকে ঘরে ডাকিয়া আনিয়া তাহার কাছ হইতে কিছু না কেনাটা ভালো হয় না।

কিছু কেনা গেল। তাহার পর পাঁচটা কথা আসিয়া পড়িল। আবদর রহমান, রুশ, ইংরেজ প্রভৃতিকে লইয়া সীমান্তরক্ষানীতি সম্বন্ধে গল্প চলিতে লাগিল।

অবশেষে উঠিয়া যাইবার সময় সে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু, তোমার লড়কি কোথা গেল।"

আমি মিনির অমূলক ভয় ভাঙাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে অন্তঃপুর হইতে ডাকাইয়া আনিলাম—সে আমার গা ঘেঁষিয়া কাবুলির মুখ এবং ঝুলির দিকে সন্দিগ্ধ নেত্রক্ষেপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কাবুলি ঝুলির মধ্য হইতে কিশমিশ খোবানি বাহির করিয়া তাহাকে দিতে গেল, সে কিছুতেই লইল না, দ্বিগুণ সন্দেহের সহিত আমার হাঁটুর কাছে সংলগ্ন হইয়া রহিল। প্রথম পরিচয়টা এমনিভাবে গেল।

কিছুদিন পরে একদিন সকালবেলায় আবশ্যকবশত বাড়ি হইতে বাহির হইবার সময় দেখি, আমার দুহিতাটি দ্বারের সমীপস্থ বেঞ্চির উপর বসিয়া অনর্গল কথা কহিয়া যাইতেছে এবং কাবুলিওয়ালা তাহার পদতলে বসিয়া সহাস্যমুখে

শুনিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে নিজের মতামতও দো-আঁশলা বাংলায় ব্যক্ত করিতেছে। মিনির পঞ্চবর্ষীয় জীবনের অভিজ্ঞতায় বাবা ছাড়া এমন ধৈর্যবান্ শ্রোতা সে কখনো পায় নাই। আবার দেখি, তাহার ক্ষুদ্র আঁচল বাদাম-কিশমিশে পরিপূর্ণ। আমি কাবুলিওয়ালাকে কহিলাম, "উহাকে এ-সব কেন দিয়াছ। অমন আর দিয়ো না।" বলিয়া পকেট হইতে একটা আধুলি লইয়া তাহাকে দিলাম। সে অসংকোচে আধুলি গ্রহণ করিয়া ঝুলিতে পুরিল।

বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, সেই আধুলিটি লইয়া ষোলো-আনা গোলযোগ বাধিয়া গেছে।

মিনির মা একটা শ্বেত চক্‌চকে গোলাকার পদার্থ লইয়া ভর্ৎসনার স্বরে মিনিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুই এ আধুলি কোথায় পেলি।"

মিনি বলিতেছে, "কাবুলিওয়ালা দিয়েছে।"

তাহার মা বলিতেছেন, "কাবুলিওয়ালার কাছ হইতে আধুলি তুই কেন নিতে গেলি।"

মিনি ক্রন্দনের উপক্রম করিয়া কহিল, "আমি চাই নি, সে আপনি দিলে।"

আমি আসিয়া মিনিকে তাহার আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া বাহিরে লইয়া গেলাম।

সংবাদ পাইলাম, কাবুলিওয়ালার সহিত মিনির এই যে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ তাহা নহে, ইতিমধ্যে সে প্রায় প্রত্যহ আসিয়া পেস্তাবাদাম ঘুষ দিয়া মিনির ক্ষুদ্র লুব্ধ হৃদয়টুকু অনেকটা অধিকার করিয়া লইয়াছে।

দেখিলাম, এই দুটি বন্ধুর মধ্যে গুটিকতক বাঁধা কথা এবং ঠাট্টা প্রচলিত আছে—যথা, রহমতকে দেখিবামাত্র আমার কন্যা হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিত, "কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা, তোমার ও ঝুলির ভিতর কী।"

রহমত একটা অনাবশ্যক চন্দ্রবিন্দু যোগ করিয়া হাসিতে হাসিতে উত্তর করিত, "হাঁতি।"

অর্থাৎ তাহার ঝুলির ভিতরে যে একটা হস্তী আছে, এইটেই তাহার পরিহাসের সূক্ষ্ম মর্ম। খুব যে বেশি সূক্ষ্ম তাহা বলা যায় না, তথাপি এই পরিহাসে উভয়েই বেশ একটু কৌতুক অনুভব করিত—এবং শরৎকালের প্রভাতে একটি বয়স্ক এবং একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর সরল হাস্য দেখিয়া আমারও বেশ লাগিত।

উহাদের মধ্যে আরো-একটা কথা প্রচলিত ছিল। রহমত মিনিকে বলিত, "খোঁখী, তোমি সসুরবাড়ি কখুনু যাবে না!'

বাঙালির ঘরের মেয়ে আজন্মকাল 'শ্বশুরবাড়ি' শব্দটার সহিত পরিচিত,

কিন্তু আমরা কিছু একেলে ধরনের লোক হওয়াতে, শিশু-মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি সম্বন্ধে সজ্ঞান করিয়া তোলা হয় নাই। এইজন্য রহমতের অনুরোধটা সে পরিষ্কার বুঝিতে পারিত না, অথচ কথাটার একটা-কোনো জবাব না দিয়া চুপ করিয়া থাকা নিতান্ত তাহার স্বভাববিরুদ্ধ, সে উলটিয়া জিজ্ঞাসা করিত, "তুমি শ্বশুরবাড়ি যাবে?"

রহমত কাল্পনিক শ্বশুরের প্রতি প্রকাণ্ড মোটা মুষ্টি আস্ফালন করিয়া বলিত, "হামি সসুরকে মারবে।"

শুনিয়া মিনি শ্বশুর নামক কোনো-এক অপরিচিত জীবের দুরবস্থা কল্পনা করিয়া অত্যন্ত হাসিত।

এখন শুভ্র শরৎকাল। প্রাচীনকালে এই সময়েই রাজারা দিগ্‌বিজয়ে বাহির হইতেন। আমি কলিকাতা ছাড়িয়া কখনো কোথাও যাই নাই, কিন্তু সেইজন্যই আমার মনটা পৃথিবীময় ঘুরিয়া বেড়ায়। আমি যেন আমার ঘরের কোণে চিরপ্রবাসী, বাহিরের পৃথিবীর জন্য আমার সর্বদা মন কেমন করে। একটা বিদেশের নাম শুনিলেই অমনি আমার চিত্ত ছুটিয়া যায়, তেমনি বিদেশী লোক দেখিলেই অমনি নদী পর্বত অরণ্যের মধ্যে একটা কুটিরের দৃশ্য মনে উদয় হয়, এবং একটা উল্লাসপূর্ণ স্বাধীন জীবনযাত্রার কথা কল্পনায় জাগিয়া উঠে।

এদিকে আবার আমি এমনি উদ্ভিজ্জপ্রকৃতি যে, আমার কোণটুকু ছাড়িয়া একবার বাহির হইতে গেলে মাথায় বজ্রাঘাত হয়। এইজন্য সকালবেলায় আমার ছোট ঘরে টেবিলের সামনে বসিয়া এই কাবুলির সঙ্গে গল্প করিয়া আমার অনেকটা ভ্রমণের কাজ হইত। দুই ধারে বন্ধুর দুর্গম দগ্ধ রক্তবর্ণ উচ্চ গিরিশ্রেণী, মধ্যে সংকীর্ণ মরুপথ, বোঝাই-করা উষ্ট্রের শ্রেণী চলিয়াছে; পাগড়িপরা বণিক ও পথিকেরা কেহবা উটের পরে, কেহ-বা পদব্রজে, কাহারো হাতে বর্শা, কাহারো হাতে সেকেলে চক্‌মকিঠোকা বন্দুক—কাবুলি মেঘমন্দ্রস্বরে ভাঙা বাংলায় স্বদেশের গল্প করিতে আর এই ছবি আমার চোখের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইত।

মিনির মা অত্যন্ত শঙ্কিত স্বভাবের লোক। রাস্তায় একটা শব্দ শুনিলে তাঁহার মনে হয়, পৃথিবীর সমস্ত মাতাল আমাদের বাড়িটাই বিশেষ লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। এই পৃথিবীটা যে সর্বত্রই চোর ডাকাত মাতাল সাপ বাঘ ম্যালেরিয়া শুঁয়োপোকা আরশোলা এবং গোরার দ্বারা পরিপূর্ণ, এতদিন (খুব বেশিদিন নহে) পৃথিবীতে বাস করিয়াও সে বিভীষিকা তাঁহার মন হইতে দূর হইয়া যায় নাই।

রহমত কাবুলিওয়ালা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসংশয় ছিলেন না। তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার জন্য তিনি আমাকে বার বার অনুরোধ

করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার সন্দেহ হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলে তিনি পর্যায়ক্রমে আমাকে গুটিকতক প্রশ্ন করিলেন, "কখনো কি কাহারো ছেলে চুরি যায় না। কাবুলদেশে কি দাস-ব্যবসায় প্রচলিত নাই। একজন প্রকাণ্ড কাবুলির পক্ষে একটি ছোট ছেলে চুরি করিয়া লইয়া যাওয়া একেবারেই কি অসম্ভব।"

আমাকে মানিতে হইল, ব্যাপারটা যে অসম্ভব তাহা নহে কিন্তু অবিশ্বাস্য। বিশ্বাস করিবার শক্তি সকলের সমান নহে এইজন্য আমার স্ত্রীর মনে ভয় রহিয়া গেল। কিন্তু তাই বলিয়া বিনা দোষে রহমতকে আমাদের বাড়িতে আসিতে নিষেধ করিতে পারিলাম না।

প্রতি বৎসর মাঘ মাসের মাঝামাঝি রহমত দেশে চলিয়া যায়। এই সময়টা সমস্ত পাওনার টাকা আদায় করিবার জন্য সে বড়ো ব্যস্ত থাকে। বাড়ি বাড়ি ফিরিতে হয় কিন্তু তবু একবার মিনিকে দর্শন দিয়া যায়। দেখিলে বাস্তবিক মনে হয়, উভয়ের মধ্যে যেন একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে। সকালে যেদিন আসিতে পারে না সেদিন দেখি সন্ধ্যার সময় আসিয়াছে; অন্ধকারে ঘরের কোণে সেই ঢিলেঢালা-জামা-পায়জামাপরা, সেই ঝোলাঝুলিওয়ালা লম্বা লোকটাকে দেখিলে বাস্তবিক হঠাৎ মনের ভিতরে একটা আশঙ্কা উপস্থিত হয়। কিন্তু যখন দেখি, মিনি কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা করিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া আসে এবং দুই অসমবয়সী বন্ধুর মধ্যে পুরাতন সরল পরিহাস চলিতে থাকে, তখন সমস্ত হৃদয় প্রসন্ন হইয়া উঠে।

একদিন সকালে আমার ছোট ঘরে বসিয়া প্রুফশিট সংশোধন করিতেছি। বিদায় লইবার পূর্বে আজ দিন দুই-তিন হইতে শীতটা খুব কন্‌কনে হইয়া উঠিয়াছে, চারিদিকে একেবারে হীহীকার পড়িয়া গেছে। জানালা ভেদ করিয়া সকালের রৌদ্রটি টেবিলের নীচে আমার পায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, সেই উত্তাপটুকু বেশ মধুর বোধ হইতেছে। বেলা বোধ করি আটটা হইবে, মাথায় গলাবন্ধ-জড়ানো উষাচরগণ প্রাতর্ভ্রমণ সমাধা করিয়া প্রায় সকলে ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে। এমন সময় রাস্তায় ভারি একটা গোল শুনা গেল।

চাহিয়া দেখি, আমাদের রহমতকে দুই পাহারাওয়ালা বাঁধিয়া লইয়া আসিতেছে—তাহার পশ্চাতে কৌতূহলী ছেলের দল চলিয়াছে। রহমতের গাত্রবস্ত্রে রক্তচিহ্ন এবং একজন পাহারাওয়ালার হাতে রক্তাক্ত ছোরা। আমি দ্বারের বাহিরে গিয়া পাহারাওয়ালাকে দাঁড় করাইলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপারটা কী।

কিয়দংশ তাহার কাছে, কিয়দংশ রহমতের কাছে শুনিয়া জানিলাম যে, আমাদের প্রতিবেশী একজন লোক রামপুরী চাদরের জন্য রহমতের কাছে

কিঞ্চিত ধারিত—মিথ্যাপূর্বক সেই দেনা সে অস্বীকার করে এবং তাহাই লইয়া বচসা করিতে করিতে রহমত তাহাকে এক ছুরি বসাইয়া দিয়াছে।

রহমত সেই মিথ্যাবাদীর উদ্দেশে নানারূপ অশ্রাব্য গালি দিতেছে, এমন সময় কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা করিয়া ডাকিতে মিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

রহমতের মুখ মুহূর্তের মধ্যে কৌতুকহাস্যে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহার স্কন্ধে আজ ঝুলি ছিল না, সুতরাং ঝুলি সম্বন্ধে তাহাদের অভ্যস্ত আলোচনা হইতে পারিল না। মিনি একেবারেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি শ্বশুরবাড়ি যাবে?"

রহমত হাসিয়া কহিল, "সিখানেই যাচ্ছে।"

দেখিল উত্তরটা মিনির হাস্যজনক হইল না, তখন হাত দেখাইয়া বলিল, "সসুরাকে মারিতাম, কিন্তু কী করিব, হাত বাঁধা।"

সাংঘাতিক আঘাত-করা অপরাধে কয়েক বৎসর রহমতের কারাদণ্ড হইল।

তাহার কথা একপ্রকার ভুলিয়া গেলাম। আমরা যখন ঘরে বসিয়া চিরাভ্যস্তমত নিত্য কাজের মধ্যে দিনের পর দিন কাটাইতাম তখন একজন স্বাধীন পর্বতচারী পুরুষ কারাপ্রাচীরের মধ্যে যে কেমন করিয়া বর্ষযাপন করিতেছে, তাহা আমাদের মনেও উদয় হইত না।

আর, চঞ্চলহৃদয়া মিনির আচরণ যে অত্যন্ত লজ্জাজনক, তাহা তাহার বাপকেও স্বীকার করিতে হয়। সে স্বচ্ছন্দে তাহার পুরাতন বন্ধুকে বিস্মৃত হইয়া প্রথমে নবী সহিসের সহিত সখ্য স্থাপন করিল। পরে ক্রমে যত তাহার বয়স বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, ততই সখার পরিবর্তে একটি একটি করিয়া সখী জুটিতে লাগিল। এমন-কি, এখন তাহার বাবার লিখিবার ঘরেও তাহাকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি তো তাহার সহিত একপ্রকার আড়ি করিয়াছি।

কতবৎসর কাটিয়া গেল। আর-একটি শরৎকাল আসিয়াছে। আমার মিনির বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। পূজার ছুটির মধ্যেই তাহার বিবাহ হইবে। কৈলাসবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘরের আনন্দময়ী পিতৃভবন অন্ধকার করিয়া পতিগৃহে যাত্রা করিবে।

প্রভাতটি অতিসুন্দর হইয়া উদয় হইয়াছে। বর্ষার পরে এই শরতের নূতন-ধৌত রৌদ্র যেন সোহাগায়-গলানো নির্মল সোনার মতো রঙ ধরিয়াছে। এমন-কি, কলিকাতার গলির ভিতরকার ইষ্টকজর্জর অপরিচ্ছন্ন ঘেঁষাঘেঁষি বাড়িগুলির উপরেও এই রৌদ্রের আভা একটি অপরূপ লাবণ্য বিস্তার করিয়াছে।

আমার ঘরে আজ রাত্রি শেষ হইতে না হইতেই সানাই বাজিতেছে। সে বাঁশি যেন আমার বুকের পঞ্জরের হাড়ের মধ্য হইতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাজিয়া উঠিতেছে।

করুণ ভৈরবী রাগিণীতে আমার আসন্ন বিচ্ছেদব্যথাকে শরতের রৌদ্রের সহিত সমস্ত বিশ্বজগৎময় ব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে। আজ আমার মিনির বিবাহ।

সকাল হইতে ভারি গোলমাল, লোকজনের আনাগোনা। উঠানে বাঁশ বাঁধিয়া পাল খাটানো হইতেছে; বাড়ির ঘরে ঘরে এবং বারান্দায় ঝাড় টাঙাইবার ঠুংঠাং শব্দ উঠিতেছে; হাঁকডাকের সীমা নাই।

আমি আমার লিখিবার ঘরে বসিয়া হিসাব দেখিতেছি, এমন সময় রহমত আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

আমি প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারিলাম না। তাহার সে ঝুলি নাই, তাহার সে লম্বা চুল নাই, তাহার শরীরে পূর্বের মতো সে তেজ নাই। অবশেষে তাহার হাসি দেখিয়া তাহাকে চিনিলাম।

কহিলাম, "কী রে রহমত, কবে আসিলি।"

সে কহিল, "কাল সন্ধ্যাবেলা জেল হইতে খালাস পাইয়াছি।"

কথাটা শুনিয়া কেমন কানে খট্ করিয়া উঠিল। কোনো খুনীকে কখনো প্রত্যক্ষ দেখি নাই, ইহাকে দেখিয়া সমস্ত অন্তঃকরণ যেন সংকুচিত হইয়া গেল। আমার ইচ্ছা করিতে লাগিল, আজিকার এই শুভদিনে এ লোকটা এখান হইতে গেলেই ভালো হয়।

আমি তাহাকে কহিলাম, "আজ আমাদের বাড়িতে একটা কাজ আছে, আমি কিছু ব্যস্ত আছি, তুমি আজ যাও।"

কথাটা শুনিয়া সে তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল, অবশেষে দরজার কাছে গিয়া একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, "খোঁখীকে একবার দেখিতে পাইব না।?"

তাহার মনে বুঝি বিশ্বাস ছিল, মিনি সেই ভাবেই আছে। সে যেন মনে করিয়াছিল, মিনি আবার সেই পূর্বের মতো 'কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা' করিয়া ছুটিয়া আসিবে, তাহাদের সেই অত্যন্ত কৌতুকাবহ পুরাতন হাস্যালাপের কোনোরূপ ব্যত্যয় হইবে না। এমন-কি, পূর্ববন্ধুত্ব স্মরণ করিয়া সে এক বাক্স আঙুর এবং কাগজের মোড়কে কিঞ্চিত কিশমিশ বাদাম বোধ করি কোনো স্বদেশী বন্ধুর নিকট হইতে চাহিয়া-চিন্তিয়া সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল—তাহার সেই নিজের ঝুলিটি আর ছিল না।

আমি কহিলাম, "আজ বাড়িতে কাজ আছে, আজ আর কাহারো সহিত দেখা হইতে পারিবে না।"

সে যেন কিছু ক্ষুণ্ন হইল। স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া একবার স্থিরদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল, তার পরে 'বাবু সেলাম' বলিয়া দ্বারের বাহির হইয়া গেল।

আমার মনে কেমন একটু ব্যথা বোধ হইল। মনে করিতেছি তাহাকে

ফিরিয়া ডাকিব, এমন সময় দেখি সে আপনি ফিরিয়া আসিতেছে।

কাছে আসিয়া কহিল, "এই আঙুর এবং কিঞ্চিৎ কিশমিশ বাদাম খোঁখীর জন্য আনিয়াছিলাম, তাহাকে দিবেন।"

আমি সেগুলি লইয়া দাম দিতে উদ্যত হইলে সে হঠাৎ আমার হাত চাপিয়া ধরিল, কহিল, "আপনার বহুত দয়া, আমার চিরকাল স্মরণ থাকিবে—আমাকে পয়সা দিবেন না।—

বাবু, তোমার যেমন একটি লড়কি আছে, তেমনি দেশে আমারও একটি লড়কি আছে। আমি তাহারই মুখখানি স্মরণ করিয়া তোমার খোঁখীর জন্য কিছু কিছু মেওয়া হাতে লইয়া আসি, আমি তো সওদা করিতে আসি না।"

এই বলিয়া সে আপনার মস্ত ঢিলা জামাটার ভিতর হাত চালাইয়া দিয়া বুকের কাছে কোথা হইতে এক টুকরা ময়লা কাগজ বাহির করিল। বহু সযত্নে ভাঁজ খুলিয়া দুই হস্তে আমার টেবিলের উপর মেলিয়া ধরিল।

দেখিলাম, কাগজের উপর একটি ছোট হাতের ছাপ। ফটোগ্রাফ নহে, তেলের ছবি নহে, হাতে খানিকটা ভূসা মাখাইয়া কাগজের উপরে তাহার চিহ্ন ধরিয়া লইয়াছে। কন্যার এই স্মরণচিহ্নটুকু বুকের কাছে লইয়া রহমত প্রতি বৎসর কলিকাতার রাস্তায় মেওয়া বেচিতে আসে—যেন সেই সুকোমল ক্ষুদ্র শিশুহস্তটুকুর স্পর্শখানি তাহার বিরাট বিরহী বক্ষের মধ্যে সুধাসঞ্চার করিয়া রাখে।

দেখিয়া আমার চোখ ছল্ ছল্ করিয়া আসিল। তখন, সে যে একজন কাবুলি মেওয়াওয়ালা আর আমি যে একজন বাঙালি সম্ভ্রান্তবংশীয়, তাহা ভুলিয়া গেলাম—তখন বুঝিতে পারিলাম, সেও যে আমিও সে, সেও পিতা আমিও পিতা। তাহার পর্বতগৃহবাসিনী ক্ষুদ্র পার্বতীর সেই হস্তচিহ্ন আমারই মিনিকে স্মরণ করাইয়া দিল। আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে অন্তঃপুর হইতে ডাকাইয়া পাঠাইলাম। অন্তঃপুরে ইহাতে অনেক আপত্তি উঠিয়াছিল। কিন্তু আমি কিছুতে কর্ণপাত করিলাম না। রাঙাচেলিপরা কপালে চন্দন-আঁকা বধূবেশিনী মিনি সলজ্জভাবে আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

তাহাকে দেখিয়া কাবুলিওয়ালা প্রথমটা থতমত খাইয়া গেল, তাহাদের পুরাতন আলাপ জমাইতে পারিল না। অবশেষে হাসিয়া কহিল, "খোঁখী, তোমি সসুরবাড়ি যাবিস্?"

মিনি এখন শ্বশুরবাড়ির অর্থ বোঝে, এখন আর সে পূর্বের মতো উত্তর দিতে পারিল না—রহমতের প্রশ্ন শুনিয়া লজ্জায় আরক্ত হইয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। কাবুলিওয়ালার সহিত মিনির যেদিন প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আমার সেই দিনের কথা মনে পড়িল। মনটা কেমন ব্যথিত হইয়া উঠিল।

মিনি চলিয়া গেলে একটা গভীর, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রহমত মাটিতে বসিয়া পড়িল। সে হঠাৎ স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, তাহার মেয়েটিও ইতিমধ্যে এইরূপ বড়ো হইয়াছে, তাহার সঙ্গেও আবার নূতন আলাপ করিতে হইবে—তাহাকে ঠিক পূর্বের মতো তেমনটি আর পাইবে না। এ আট বৎসরে তাহার কী হইয়াছে তাই বা কে জানে। সকালবেলায় শরতের স্নিগ্ধ রৌদ্রকিরণের মধ্যে সানাই বাজিতে লাগিল, রহমত কলিকাতার এক গলির ভিতরে বসিয়া আফগানিস্থানের এক মরুপর্বতের দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

আমি একখানি নোট লইয়া তাহাকে দিলাম। বলিলাম, "রহমত, তুমি দেশে তোমার মেয়ের কাছে ফিরিয়া যাও; তোমাদের মিলনসুখে আমার মিনির কল্যাণ হউক।"

এই টাকাটা দান করিয়া হিসাব হইতে উৎসব-সমারোহের দুটো-একটা অঙ্গ ছাঁটিয়া দিতে হইল। যেমন মনে করিয়াছিলাম তেমন করিয়া ইলেকট্রিক আলো জ্বালাইতে পারিলাম না, গড়ের বাদ্যও আসিল না, অন্তঃপুরে মেয়েরা অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু মঙ্গল-আলোকে আমার শুভ উৎসব উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

অগ্রহায়ণ ১২৯৯

মহেশ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

॥ এক ॥

গ্রামের নাম কাশীপুর। গ্রাম ছোট, জমিদার আরও ছোট—তবু দাপটে তাঁহার প্রজারা টুঁ শব্দটি করিতে পারে না—এমনই প্রতাপ।

ছোটছেলের জন্মতিথি পূজা। পূজা সারিয়া তর্করত্ন দ্বিপ্রহরবেলায় বাটী ফিরিতেছিলেন। বৈশাখ শেষ হইয়া আসে কিন্তু মেঘের ছায়াটুকু কোথাও নাই, অনাবৃষ্টির আকাশ হইতে যেন আগুন ঝরিয়া পড়িতেছে।

সম্মুখের দিগন্তজোড়া মাঠখানা জ্বলিয়া-পুড়িয়া ফুটিফাটা হইয়া আছে, আর সেই লক্ষ ফাটল দিয়া ধরিত্রীর বুকের রক্ত নিরন্তর ধুঁয়া হইয়া উড়িয়া যাইতেছে। অগ্নিশিখার মতো তাহাদের সর্পিল ঊর্ধ্বগতির প্রতি চাহিয়া থাকিলে মাথা ঝিমঝিম করে—যেন নেশা লাগে।

ইহারই সীমানায় পথের ধারে গফুর জোলার বাড়ি। তাহার প্রাচীর পড়িয়া গিয়া প্রাঙ্গণ আসিয়া পথে মিশিয়াছে এবং অন্তঃপুরের লজ্জা-সম্ভ্রম পথিকের করুণায় আত্মসমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে।

পথের ধারে একটা গাছের ছায়ায় দাঁড়াইয়া তর্করত্ন উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলেন, ওরে, ও গফরা, বলি, ঘরে আছিস?

তাহার বছর-দশেকের মেয়ে দুয়ারে দাঁড়াইয়া সাড়া দিল, কেন বাবাকে? বাবার যে জ্বর।

জ্বর! ডেকে দে হারামজাদাকে। পাষণ্ড! ম্লেচ্ছ!

হাঁক-ডাকে গফুর মিঞা ঘর হইতে বাহির হইয়া জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ভাঙা প্রাচীরের গা ঘেঁষিয়া একটা পুরাতন বাবলা গাছ—তাহার ডালে বাঁধা একটা ষাঁড়। তর্করত্ন দেখাইয়া কহিলেন, ওটা হচ্চে

কী শুনি? এ হিঁদুর গাঁ, ব্রাহ্মণ জমিদার, সে খেয়াল আছে? তাঁর মুখখানা রাগে ও রৌদ্রের ঝাঁঝে রক্তবর্ণ, সুতরাং সে-মুখ দিয়া তপ্ত খরবাক্যই বাহির হইবে, কিন্তু হেতুটা বুঝিতে না-পারিয়া গফুর শুধু চাহিয়া রহিল।

তর্করত্ন বলিলেন, সকালে যাবার সময় দেখে গেছি বাঁধা, দুপুরে ফেরবার পথে দেখছি তেমনি ঠায় বাঁধা। গো-হত্যা হলে যে কর্তা তোকে জ্যান্ত কবর দেবে। সে যে-সে বামুন নয়!

কী করব বাবাঠাকুর, বড় লাচারে পড়ে গেছি। কদিন থেকে গায়ে জ্বর, দড়ি ধরে যে দু-খুঁটো খাইয়ে আনব— তা মাথা ঘুরে পড়ে যাই।

তবে ছেড়ে দে না, আপনি চরাই করে আসুক।

কোথায় ছাড়ব বাবাঠাকুর, লোকের ধান এখনো ঝাড়া হয়নি—খামারে পড়ে; খড় এখনো গাদি দেওয়া হয়নি, মাঠের আলগুলো সব জ্বলে গেল—কোথাও এক মুঠো ঘাস নেই। কার ধানে মুখ দেবে, কার গাদা ফেড়ে খাবে—ক্যামনে ছাড়ি বাবাঠাকুর?

তর্করত্ন একটু নরম হইয়া কহিলেন, না ছাড়িস তো ঠাণ্ডায় কোথাও বেঁধে দিয়ে দু-আঁটি বিচুলি ফেলে দে না, ততক্ষণ চিবোক। তোর মেয়ে ভাত রাঁধেনি? ফ্যানে-জলে দে না, এক গামলা খাক্।

গফুর জবাব দিল না। নিরুপায়ের মতো তর্করত্নের মুখের পানে চাহিয়া তাহার নিজের মুখ দিয়া শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

তর্করত্ন বলিলেন, তাও নেই বুঝি? কী করলি খড়? ভাগে এবারে যা পেলি সমস্ত বেচে পেটায় নমঃ? গরুটার জন্য এক আঁটি ফেলে রাখতে নেই? ব্যাটা কসাই!

এই নিষ্ঠুর অভিযোগে গফুরের যেন বাকরোধ হইয়া গেল। ক্ষণেক পরে ধীরে ধীরে কহিল, কাহন-খানেক খড় এবার ভাগে পেয়েছিলাম, কিন্তু গেল সনের বকেয়া বলে কর্তামশায় সব ধরে রাখলেন। কেঁদে-কেটে হাতেপায়ে পড়ে বললাম, বাবুমশাই, হাকিম তুমি, তোমার রাজত্বি ছেড়ে আর পালাব কোথায়, আমাকে পণ-দশেক বিচুলিও নাহয় দাও। চালে খড় নেই—একখানি ঘর, বাপ-বেটিতে থাকি, তাও নাহয় তালপাতার গোঁজা-গাঁজা দিয়ে এ-বর্ষাটা কাটিয়ে দেব, কিন্তু না-খেতে পেয়ে আমার মহেশ মরে যাবে।

তর্করত্ন হাসিয়া কহিলেন, ইশ! সাধ করে আবার নাম রাখা হয়েছে মহেশ! হেসে বাঁচিনে!

কিন্তু এ বিদ্রূপ গফুরের কানে গেল না, সে বলিতে লাগিল, কিন্তু হাকিমের দয়া হল না। মাস-দুয়েক খোরাকের মতো ধান দুটি আমাদের দিলেন, কিন্তু বেবাক খড় সরকারে গাদা হয়ে গেল, ও আমার কুটোটি পেলে না।—বলিতে

বলিতে কণ্ঠস্বর তাহার অশ্রুভারে ভারী হইয়া উঠিল। কিন্তু তর্করত্নের তাহাতে করুণার উদয় হইল না; কহিলেন, আচ্ছা মানুষ তো তুই—খেয়ে রেখেছিস, দিবি-নে? জমিদার কি তোকে ঘর থেকে খাওয়াবে না-কি? তোরা তো রাম-রাজত্বে বাস করিস—ছোটলোক কিনা, তাই তাঁর নিন্দে করে মরিস।

গফুর লজ্জিত হইয়া বলিল, নিন্দে করব কেন বাবাঠাকুর, নিন্দে তাঁর আমরা করিনে। কিন্তু কোথা থেকে দিই, বলো তো? বিঘে-চারেক জমি ভাগে করি, কিন্তু উপরি উপরি দু-সন অজম্মা—মাঠের ধান মাঠে শুকিয়ে গেল—বাপ-বেটিতে দুবেলা দুটো পেট ভরে খেতে পর্যন্ত পাইনে। ঘরের পানে চেয়ে দেখ, বিষ্টি-বাদলে মেয়েটিকে নিয়ে কোণে বসে রাত কাটাই, পা ছড়িয়ে শোবার ঠাঁই মেলে না। মহেশকে একটিবার তাকিয়ে দেখ, পাঁজরা গোনা যাচ্চে—দাও না ঠাকুরমশাই কাহন-দুই ধার, গরুটারে দুদিন পেটপুরে খেতে দিই।—বলিতে বলিতেই সে ধপ করিয়া ব্রাহ্মণের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল। তর্করত্ন তীরবৎ দু-পা পিছাইয়া গিয়া কহিলেন, আ মর্, ছুঁয়ে ফেলবি না-কি?

না বাবাঠাকুর, ছোঁব কেন, ছোঁব না। কিন্তু দাও এবার আমাকে কাহন-দুই খড়। তোমার চার-চারটে গাদা সেদিন দেখে এসেছি—একটি দিলে তুমি টেরও পাবে না। আমরা না-খেয়ে মরি ক্ষেতি নেই, কিন্তু ও আমার অবলা জীব—কথা বলতে পারে না, শুধু চেয়ে থাকে, আর চোখ দিয়ে জল পড়ে।

তর্করত্ন কহিলেন, ধার নিবি, শুধবি কী করে শুনি?

গফুর আশান্বিত হইয়া ব্যগ্রস্বরে বলিয়া উঠিল, যেমন করে পারি শুধব বাবাঠাকুর, তোমাকে ফাঁকি দেব না।

তর্করত্ন মুখে একপ্রকার শব্দ করিয়া গফুরের ব্যাকুলকণ্ঠের অনুকরণ করিয়া কহিলেন, ফাঁকি দেব না, যেমন করে পারি শুধব! রসিক নাগর। যা যা সর্, পথ ছাড়্। ঘরে যাই, বেলা হয়ে গেল। এই বলিয়া তিনি একটু মুচকিয়া হাসিয়া পা বাড়াইয়া সহসা সভয়ে পিছাইয়া গিয়া সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন, আ মর্ শিঙ নেড়ে আসে যে, গুঁতোবে না-কি!

গফুর উঠিয়া দাঁড়াইল। ঠাকুরের হাতে ফলমূল ও ভিজা চালের পুঁটুলি ছিল, সেইটা দেখাইয়া কহিল, গন্ধ পেয়েচে, একমুঠো খেতে চায়—

খেতে চায়? তা বটে! যেমন চাষা তার তেমনি বলদ। খড় জোটে না, চাল-কলা খাওয়া চাই! নে নে, পথ থেকে সরিয়ে বাঁধ। যে শিঙ কোন্‌দিন দেখচি কাকে খুন করবে। এই বলিয়া তর্করত্ন পাশ কাটাইয়া হনহন করিয়া চলিয়া গেলেন।

গফুর সেদিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া মহেশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার গভীর কালো চোখদুটি বেদনা ও ক্ষুধায় ভরা,

কহিল, তোকে দিলে না একমুঠো? ওদের অনেক আছে, তবু দেয় না! না দিক্‌গে—তাহার গলা বুজিয়া আসিল, তার পরে চোখ দিয়া টপটপ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। কাছে আসিয়া নীরবে ধীরে ধীরে তাহার গলায় মাথায় পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে চুপি চুপি বলিতে লাগিল, মহেশ, তুই আমার ছেলে, তুই আমাদের আট সন প্রতিপালন করে বুড়ো হয়েছিস, তোকে আমি পেটপুরে খেতে দিতে পারিনে—কিন্তু তুই তো জানিস, তোকে আমি কত ভালোবাসি।

মহেশ প্রত্যুত্তরে শুধু গলা বাড়াইয়া আরামে চোখ বুজিয়া রহিল। গফুর চোখের জল গরুটার পিঠের উপর রগরাইয়া মুছিয়া ফেলিয়া তেমনি অস্ফুটে কহিতে লাগিল, জমিদার তোর মুখের খাবার কেড়ে নিলে, শ্মশান ধারে গাঁয়ের যে গোচরটুকু ছিল তাও পয়সার লোভে জমা-বিলি করে দিলে, এই দুর্বচ্ছরে তোকে কেমন করে বাঁচিয়ে রাখি বল্? ছেড়ে দিলে তুই পরের গাদা ফেড়ে খাবি, মানুষের কলাগাছে মুখ দিবি—তোকে নিয়ে আমি কী করি! গায়ে আর তোর জোর নেই, দেশের কেউ তোকে চায় না—লোকে বলে, তোকে গোহাটায় বেচে ফেলতে—কথাটা মনে মনে উচ্চারণ করিয়াই আবার তাহার দু-চোখ বাহিয়া টপ টপ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া গফুর একবার এদিকে-ওদিকে চাহিল, তারপরে ভাঙা ঘরের পিছন হইতে কতকটা পুরানো বিবর্ণ খড় আনিয়া মহেশের মুখের কাছে রাখিয়া দিয়া আস্তে আস্তে কহিল, নে, শিগগির করে একটু খেয়ে নে বাবা, দেরি হলে আবার—

বাবা!

কেন মা?

ভাত খাবে এসো—এই বলিয়া আমিনা ঘর হইতে দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল। এক-মুহূর্ত চাহিয়া থাকিয়া কহিল, মহেশকে আবার চাল ফেড়ে খড় দিয়েচ, বাবা?

ঠিক এই ভয়ই সে করিতেছিল, লজ্জিত হইয়া বলিল, পুরোনো পচা খড় মা, আপনিই ঝরে যাচ্ছিল—

আমি যে ভেতর থেকে শুনতে পেলাম বাবা, তুমি টেনে বার করচ?

না মা, ঠিক টেনে নয় বটে—

কিন্তু দেয়ালটা যে পড়ে যাবে বাবা—

গফুর চুপ করিয়া রহিল। একটিমাত্র ঘর ছাড়া যে আর সবই গিয়াছে এবং এমন থারা করিলে আগামী বর্ষায় ইহাও টিকিবে না, এ-কথা তাহার নিজের চেয়ে আর কে বেশি জানে? অথচ এ-উপায়েই বা কটা দিন চলে!

মেয়ে কহিল, হাত ধুয়ে ভাত খাবে এসো বাবা, আমি বেড়ে দিয়েচি।

গফুর কহিল, ফ্যানটুকু দে তো মা, একেবারে খাইয়ে দিয়ে যাই।

ফ্যান যে নেই বাবা, হাঁড়িতেই মরে গেছে।

নেই? গফুর নীরব হইয়া রহিল। দুঃখের দিনে এটুকুও যে নষ্ট করা যায় না— এই দশ বছরের মেয়েটাও তাহা বুঝিয়াছে। হাত ধুইয়া সে ঘরের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইল। একটা পিতলের থালায় পিতার শাকান্ন সাজাইয়া দিয়া কন্যা নিজের জন্য একখানি মাটির সানকিতে ভাত বাড়িয়া লইয়াছে। চাহিয়া চাহিয়া গফুর আস্তে আস্তে কহিল, আমিনা, আমার গায়ে যে শীত করে মা—জ্বর-গায়ে খাওয়া কি ভালো?

আমিনা উদ্বিগ্নমুখে কহিল, কিন্তু তখন যে বললে, বড় ক্ষিধে পেয়েচে?

তখন? তখন হয়তো জ্বর ছিল না মা।

তাহলে তুলে রেখে দি, সাঁঝের-বেলা খেয়ো?

গফুর মাথা নাড়িয়া বলিল, কিন্তু ঠাণ্ডা ভাত খেলে যে অসুখ বাড়বে আমিনা।

আমিনা কহিল, তবে?

গফুর কত কী যেন চিন্তা করিয়া হঠাৎ এই সমস্যার মীমাংসা করিয়া ফেলিল; কহিল, এক কাজ করো না মা, মহেশকে নাহয় ধরে দিয়ে আয়। তখন রাতের-বেলা আমাকে একমুঠো ফুটিয়ে দিতে পারবিনে আমিনা? প্রত্যুত্তরে আমিনা মুখ তুলিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, পারব বাবা।

গফুরের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। পিতা ও কন্যার মাঝখানে এই-যে একটুখানি ছলনার অভিনয় হইয়া গেল, তাহা এই দুটি প্রাণী ছাড়া আরও একজন বোধ করি অন্তরীক্ষে থাকিয়া লক্ষ্য করিলেন।

॥ দুই ॥

পাঁচ-সাতদিন পরে একদিন পীড়িত গফুর চিন্তিতমুখে দাওয়ায় বসিয়াছিল, তাহার মহেশ কাল হইতে এখন পর্যন্ত ঘরে ফিরে নাই। নিজে সে শক্তিহীন, তাই আমিনা সকাল হইতে সর্বত্র খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। পড়ন্ত-বেলায় সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, শুনেচ বাবা, মানিক ঘোষেরা মহেশকে আমাদের থানায় দিয়েছে।

গফুর কহিল, দূর পাগলি!

হাঁ বাবা, সত্যি। তাদের চাকর বললে, তোর বাপকে বল্‌গে যা দরিয়াপুরের খোঁয়াড়ে খুঁজতে।

কী করেছিল সে?

তাদের বাগানে ঢুকে গাছপালা নষ্ট করেছে বাবা।

গফুর স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। মহেশের সম্বন্ধে সে মনে-মনে বহুপ্রকারের দুর্ঘটনা কল্পনা করিয়াছিল, কিন্তু ও আশঙ্কা ছিল না। সে যেমন নিরীহ তেমনি গরিব, সুতরাং প্রতিবেশী কেহ তাহাকে এতবড় শাস্তি দিতে পারে—এ ভয় তাহার নাই। বিশেষত মানিক ঘোষ। গো-ব্রাহ্মণে ভক্তি তাহার এ-অঞ্চলে বিখ্যাত।

মেয়ে কহিল, বেলা যে পড়ে এল বাবা, মহেশকে আনতে যাবে না?

গফুর বলিল, না।

কিন্তু তারা যে বললে, তিনদিন হলেই পুলিশের লোক তাকে গো-হাটায় বেচে ফেলবে?

গফুর কহিল, ফেলুকগে।

গো-হাটা বস্তুটা যে ঠিক কী, আমিনা তাহা জানিত না, কিন্তু মহেশের সম্পর্কে ইহার উল্লেখমাত্রই তাহার পিতা যে কিরূপ বিচলিত হইয়া উঠিত ইহা সে বহুবার লক্ষ্য করিয়াছে, কিন্তু আজ সে আর কোনো কথা না-কহিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

রাত্রের অন্ধকারে লুকাইয়া গফুর বংশীর দোকানে আসিয়া কহিল, খুড়ো, একটা টাকা দিতে হবে, এই বলিয়া সে তাহার পিতলের থালাটি বসিবার মাচার নিচে রাখিয়া দিল। এই বস্তুটির ওজন ইত্যাদি বংশীর সুপরিচিত। বছর-দুয়ের মধ্যে সে বার-পাঁচেক ইহাকে বন্ধক রাখিয়া একটি করিয়া টাকা দিয়াছে। অতএব আজও আপত্তি করিল না।

পরদিন যথাস্থানে আবার মহেশকে দেখা গেল। সেই বাবলাতলা, সেই দড়ি, সেই খুঁটা, সেই তৃণহীন শূন্য আধার, সেই ক্ষুধাতুর কালো চোখের সজল উৎসুক দৃষ্টি। একজন বুড়ো-গোছের মুসলমান তাহাকে অত্যন্ত তীব্র চক্ষু দিয়া পর্যবেক্ষণ করিতেছিল। অদূরে একধারে দুই হাঁটু জড়ো করিয়া গফুর মিঞা চুপ করিয়া বসিয়াছিল, পরীক্ষা শেষ করিয়া বুড়ো চাদরের খুঁট হইতে একখানা দশটাকার নোট বাহির করিয়া তাহার ভাঁজ খুলিয়া বারবার মসৃণ করিয়া লইয়া তাহার কাছে গিয়া কহিল, আর ভাঙাব না, এই পুরোপুরিই দিলাম—নাও।

গফুর হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিয়া তেমনি নিঃশব্দেই বসিয়া রহিল। যে-দুইজন লোক সঙ্গে আসিয়াছিল তাহারা গরুর দড়ি খুলিবার উদ্যোগ করিতেই

কিন্তু সে অকস্মাৎ সোজা হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া উদ্ধতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, দড়িতে হাত দিয়ো না বলচি—খবরদার বলচি, ভালো হবে না!

তাহারা চমকিয়া গেল। বুড়ো আশ্চর্য হইয়া কহিল, কেন?

গফুর তেমনি রাগিয়া জবাব দিল, কেন আবার কী! আমার জিনিশ আমি বেচব না—আমার খুশি। বলিয়া সে নোটখানা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।

তাহারা কহিল, কাল পথে আসতে বায়না নিয়ে এলে যে?

এই নাও না তোমাদের বায়না ফিরিয়ে! বলিয়া সে ট্যাঁক হইতে দুটা টাকা বাহির করিয়া ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিল। একটা কলহ বাধিবার উপক্রম হয় দেখিয়া বুড়ো হাসিয়া ধীরভাবে কহিল, চাপ দিয়ে আর দুটো-টাকা বেশি নেবে, এই তো? দাও হে, পান খেতে ওর মেয়ের হাতে দুটো টাকা দাও। কেমন, এই না?

না।

কিন্তু এর বেশি কেউ একটা আধলা দেবে না, তা জানো?

গফুর সজোরে মাথা নাড়িয়া কহিল, না।

বুড়ো বিরক্ত হইল, কহিল, না তো কী? চামড়াটাই যে দামে বিকোবে, নইলে মাল আর আছে কী?

তোবা! তোবা! গফুরের মুখ দিয়া একটা বিশ্রী কটু কথা বাহির হইয়া গেল এবং পরক্ষণেই সে ছুটিয়া গিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া চিৎকার করিয়া শাসাইতে লাগিল যে, তাহারা যদি অবিলম্বে গ্রাম ছাড়িয়া না যায় তো জমিদারের লোক ডাকিয়া জুতা-পেটা করিয়া ছাড়িবে।

হাঙ্গামা দেখিয়া লোকগুলা চলিয়া গেল কিন্তু কিছুক্ষণেই জমিদারের সদর হইতে তাহার ডাক পড়িল। গফুর বুঝিল, এ-কথা কর্তার কানে গিয়াছে।

সদরে ভদ্র অভদ্র অনেকগুলি ব্যক্তি বসিয়াছিল। শিবুবাবু চোখ রাঙা করিয়া কহিলেন, গফ্‌রা, তোকে যে আমি কী সাজা দেব ভেবে পাইনে। কোথায় বাস করে আছিস, জানিস?

গফুর হাতজোড় করিয়া কহিল, জানি। আমরা খেতে পাইনে, নইলে আজ আপনি যা জরিমানা করতেন আমি না-করতাম না।

সকলেই বিস্মিত হইল। এই লোকটাকে জেদি এবং বদমেজাজি বলিয়াই তাহারা জানিত। সে কাঁদো-কাঁদো হইয়া কহিল, এমন কাজ আর কখনো করব না কর্তা! বলিয়া সে নিজের দুইহাত দিয়া নিজের দুইকান মলিল এবং প্রাঙ্গণের একদিক হইতে আর-একদিক পর্যন্ত নাকখত দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

শিববাবু সদয়কণ্ঠে কহিলেন, আচ্ছা, যা যা হয়েচে। আর কখনো এসব মতি-বুদ্ধি করিসনে।

বিবরণ শুনিয়া সকলেই কণ্টকিত হইয়া উঠিলেন এবং এ মহাপাতক-যে শুধু কর্তার পুণ্য প্রভাবে ও শাসনভয়েই নিবারিত হইয়াছে সে-বিষয়ে কাহারও সংশয়মাত্র রহিল না। তর্করত্ন উপস্থিত ছিলেন, তিনি গো-শব্দের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা করিলেন এবং যেজন্য এই ধর্মজ্ঞানহীন ম্লেচ্ছজাতিকে গ্রামের ত্রিসীমানায় বসবাস করিতে দেয়া নিষিদ্ধ তাহা প্রকাশ করিয়া সকলের জ্ঞাননেত্র বিকশিত করিয়া দিলেন।

গফুর একটা কথার জবাব দিল না, যথার্থ প্রাপ্য মনে করিয়া অপমান ও সকল তিরস্কার সবিনয়ে মাথা পাতিয়া লইয়া প্রসন্নচিত্তে ঘরে ফিরিয়া আসিল। প্রতিবেশীদের গৃহ হইতে ফ্যান চাহিয়া আনিয়া মহেশকে খাওয়াইল এবং তাহার গায়ে, মাথায় ও শিঙে বারংবার হাত বুলাইয়া অস্ফুটে কত কথাই বলিতে লাগিল।

॥ তিন ॥

জ্যৈষ্ঠ শেষ হইয়া আসিল। রুদ্রের যে-মূর্তি একদিন শেষ বৈশাখে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, সে-যে কত ভীষণ, কতবড় কঠোর হইয়া উঠিতে পারে তাহা আজিকার আকাশের প্রতি না-চাহিলে উপলব্ধি করাই যায় না। কোথাও যেন করুণার আভাস পর্যন্ত নাই। কখনো এ-রূপের লেশমাত্র পরিবর্তন হইতে পারে, আবার কোনোদিন এ-আকাশ মেঘভারে স্নিগ্ধ সজল হইয়া দেখা দিতে পারে, আজ এ-কথা ভাবিতেও যেন ভয় হয়। মনে হয় সমস্ত প্রজ্বলিত নভঃস্থল ব্যাপিয়া যে-অগ্নি অহরহ ঝরিতেছে ইহার অন্ত নাই, সমাপ্তি নাই—সমস্ত নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া না-গেলে এ আর থামিবে না।

এমনি দিনে দ্বিপ্রহর-বেলায় গফুর ঘরে ফিরিয়া আসিল। পরের দ্বারে জনমজুর খাটা তাহার অভ্যাস নয় এবং মাত্র দিন চার-পাঁচ তাহার জ্বর থামিয়াছে, কিন্তু দেহ যেমন দুর্বল তেমনি শ্রান্ত, তবুও আজ সে কাজের সন্ধানে বাহির হইয়াছিল, কিন্তু এই প্রচণ্ড রৌদ্র কেবল তাহার মাথার উপর দিয়া গিয়াছে, আর কোনো ফল হয় নাই। ক্ষুধায় পিপাসায় ও ক্লান্তিতে সে প্রায় অন্ধকার দেখিতেছিল, প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ডাক দিল, আমিনা ভাত হয়েছে রে?

মেয়ে ঘর হইতে আস্তে আস্তে বাহির হইয়া নিরুত্তরে খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইল।

জবাব না-পাইয়া গফুর চেঁচাইয়া কহিল, হয়েছে ভাত? কী বললি—হয়নি? কেন শুনি?

চাল নেই বাবা!

চাল নেই? সকালে আমাকে বলিসনি কেন?

তোমাকে রাত্তিরে যে বলেছিলুম!

গফুর মুখ ভ্যাঙাইয়া কণ্ঠস্বর অনুকরণ করিয়া কহিল, রাত্তিরে যে বলেছিলুম! রাত্তিরে বললে কারু মনে থাকে? নিজের কর্কশকণ্ঠে ক্রোধ তাহার দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। মুখ অধিকতর বিকৃত করিয়া বলিয়া উঠিল, চাল থাকবে কী করে? রোগা বাপ খাক্ আর না-খাক্, বুড়ো মেয়ে চারবার-পাঁচবার করে ভাত গিলবি! এবার থেকে চাল আমি কুলুপবন্ধ করে বাইরে যাব। দে, এক ঘটি জল দে, তেষ্টায় বুক ফেটে গেল। বল্, তাও নেই।

আমিনা তেমনি অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া গফুর বুঝিল, গৃহে তৃষ্ণার জল পর্যন্ত নাই, তখন সে আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। দ্রুতপদে কাছে গিয়া ঠাস করিয়া সশব্দে তাহার গালে এক চড় কষাইয়া দিয়া কহিল, মুখপোড়া হারামজাদা মেয়ে, সারাদিন তুই করিস কী? এত লোকে মরে, তুই মরিসনে!

মেয়ে কথাটি কহিল না, মাটির শূন্য কলসিটি তুলিয়া লইয়া সেই রৌদ্রের মাঝেই চোখ মুছিতে মুছিতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। সে চোখের আড়াল হইতেই কিন্তু গফুরের বুকে শেল বিঁধিল। মা-মরা এই মেয়েটিকে সে যে কী করিয়া মানুষ করিয়াছে, সে-কেবল সে-ই জানে। তাহার মনে পড়িল তাহার এই স্নেহশীলা কর্মপরায়ণা শান্ত মেয়েটির কোনো দোষ নাই। ক্ষেতের সামান্য ধান-কয়টি ফুরানো পর্যন্ত তাহাদের পেট ভরিয়া দুবেলা অন্ন জুটে না। কোনোদিন একবেলা, কোনোদিন বা তাহাও নয়। দিনে পাঁচ-ছয়বার ভাত খাওয়া যেমন অসম্ভব তেমনি মিথ্যা। এবং পিপাসার জল না-থাকার হেতুও তাহার অবিদিত নয়। গ্রামে যে দুই-তিনটা পুষ্করিণী আছে তাহা একেবারে শুষ্ক। শিবচরণবাবুর খিড়কির পুকুরে যা একটু জল আছে তা সাধারণে পায় না। অন্যান্য জলাশয়ের মাঝখানে দু-একটা গর্ত খুঁড়িয়া যাহা-কিছু জল সঞ্চিত হয় তাহাতে যেমন কাড়াকাড়ি, তেমনি ভিড়। বিশেষত মুসলমান বলিয়া এই ছোট মেয়েটা তো কাছেই ঘেঁষিতে পারে না। ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা দূরে দাঁড়াইয়া বহু অনুনয়-বিনয়ে কেহ দয়া করিয়া যদি তাহার পাত্রে একটু ঢালিয়া দেয়, সেইটুকুই সে ঘরে আনে। এ সমস্তই সে জানে। হয়তো আজ জল ছিল না, কিংবা কাড়াকাড়ির মাঝখানে কেহ মেয়েকে তাহার কৃপা করিবার অবসর পায় নাই—এমনিই একটা হইয়া থাকিবে নিশ্চয় বুঝিয়া তাহার নিজের চোখেও জল ভরিয়া আসিল। এমনি সময়ে জমিদারের পিয়াদা যমদূতের ন্যায় আসিয়া

প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া চিৎকার করিয়া ডাকিল, গফ্‌রা ঘরে আছিস?

গফুর তিক্তকণ্ঠে সাড়া দিয়া কহিল, আছি। কেন?

বাবুমশায় ডাকচেন, আয়।

গফুর কহিল, আমার খাওয়াদাওয়া হয়নি, পরে যাব।

এতবড় স্পর্ধা পিয়াদার সহ্য হইল না। সে কুৎসিত একটা সম্বোধন করিয়া কহিল, বাবুর হুকুম জুতো মারতে মারতে টেনে নিয়ে যেতে।

গফুর দ্বিতীয়বার আত্মবিস্মৃত হইল, সেও একটা দুর্বাক্য উচ্চারণ করিয়া কহিল, মহারানীর রাজত্বে কেউ কারো গোলাম নয়। খাজনা দিয়ে বাস করি, আমি যাব না।

কিন্তু সংসারে অত ক্ষুদ্রের অতবড় দোহাই দেয়া বিফল নয়, বিপদের কারণ। রক্ষা এই যে, অত ক্ষীণকণ্ঠ অতবড় কানে গিয়া পৌছায় না—না হইলে তাঁহার মুখের অন্ন ও চোখের নিদ্রা দুই-ই ঘুচিয়া যাইত। তাহার পর কী ঘটিল বিস্তারিত করিয়া বলার প্রয়োজন নাই, কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরে যখন সে জমিদারের সদর হইতে ফিরিয়া ঘরে গিয়া নিঃশব্দে শুইয়া পড়িল তখন তাহার চোখমুখ ফুলিয়া উঠিয়াছে। ইহার এতবড় শাস্তির হেতু প্রধানত মহেশ। গফুর বাটী হইতে বাহির হইবার পরে সেও দড়ি ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া পড়ে এবং জমিদারের প্রাঙ্গণে ঢুকিয়া ফুলগাছ খাইয়াছে, ধান শুকাইতেছিল তাহা ফেলিয়া ছড়াইয়া নষ্ট করিয়াছে, পরিশেষে ধরিবার উপক্রম করায় বাবুদের ছোটমেয়েকে ফেলিয়া দিয়া পলায়ন করিয়াছে। এরূপ ঘটনা আজ প্রথম নয়—ইতিপূর্বেও ঘটিয়াছে, শুধু গরিব বলিয়া তাহাকে মাফ করা হইয়াছে। পূর্বের মতো এবারও সে আসিয়া হাতে-পায়ে পড়িলে হয়তো ক্ষমা করা হইত, কিন্তু সে-যে কর দিয়া বাস করে বলিয়া, কাহারও গোলাম নয় বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে—প্রজার মুখের এতবড় স্পর্ধা জমিদার হইয়া শিবচরণ বাবু কোনোমতেই সহ্য করিতে পারেন নাই। সেখানে সে প্রহার ও লাঞ্ছনার প্রতিবাদ-মাত্র করে নাই, সমস্ত মুখ বুজিয়া সহিয়াছে, ঘরে আসিয়াও সে তেমনি নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল। ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা তাহার মনে ছিল না, কিন্তু বুকের ভিতরটা জ্বলিতে লাগিল। এমন কতক্ষণ কাটিল তাহার হুঁশ ছিল না, কিন্তু প্রাঙ্গণ হইতে সহসা তাহার মেয়ের আর্তকণ্ঠ কানে যাইতেই সে সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ছুটিয়া বাহিরে আসিতে দেখিল, আমিনা মাটিতে পড়িয়া এবং তাহার বিক্ষিপ্ত ভাঙা ঘট হইতে জল ঝরিয়া পড়িতেছে। আর মহেশ মাটিতে মুখ দিয়া সেই জল মরুভূমির মতো যেন শুষিয়া খাইতেছে। চোখের পলক পড়িল না, গফুর দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া গেল। মেরামত করিবার জন্য

কাল সে তাহার লাঙলের মাথাটা খুলিয়া রাখিয়াছিল, তাহাই দুই হাতে গ্রহণ করিয়া সে মহেশের অবনত মাথার উপর সজোরে আঘাত করিল।

একটিবার মাত্র মহেশ মুখ তুলিবার চেষ্টা করিল, তাহার পরেই তাহার অনাহারক্লিষ্ট শীর্ণদেহ ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল। চোখের কোণ বহিয়া কয়েক বিন্দু অশ্রু ও কান বহিয়া ফোঁটা-কয়েক রক্ত গড়িয়া পড়িল। বার-দুই সমস্ত শরীরটা তাহার থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, তারপরে সম্মুখ ও পশ্চাতের পা দুটা তার যতদূর যায় প্রসারিত করিয়া দিয়া মহেশ শেষনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

আমিনা কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, কী করলে বাবা, আমাদের মহেশ যে মরে গেল!

গফুর নড়িল না, জবাব দিল না, শুধু নিমেষচক্ষে আর-একজোড়া নিমেষহীন গভীর কালো চক্ষের পানে চাহিয়া পাথরের মতো নিশ্চল হইয়া রহিল।

ঘণ্টা-দুয়ের মধ্যে সংবাদ পাইয়া গ্রামান্তের মুচির দল আসিয়া জুটিল, তাহারা বাঁশে বাঁধিয়া মহেশকে ভাগাড়ে লইয়া চলিল। তাহাদের হাতে ধারালো চকচকে ছুরি দেখিয়া গফুর শিহরিয়া চক্ষু মুদিল, কিন্তু একটি কথাও কহিল না।

পাড়ার লোকে কহিল, তর্করত্নের কাছে ব্যবস্থা নিতে জমিদার লোক পাঠিছেন, প্রাচিত্তিরের খরচ যোগাতে এবার তোকে না ভিটে বেচতে হয়।

গফুর এ-সকল কথারও উত্তর দিল না, দুই হাঁটুর উপর মুখ রাখিয়া ঠায় বসিয়া রহিল।

অনেক রাত্রে গফুর মেয়েকে তুলিয়া কহিল, আমিনা, চল আমরা যাই—

সে দাওয়ায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, কোথায় বাবা?

গফুর কহিল, ফুলবেড়ের চটকলে কাজ করতে।

মেয়ে আশ্চর্য হইয়া চাহিয়া রহিল। ইতিপূর্বে অনেক দুঃখেও পিতা তাহার কলে কাজ করিতে রাজি হয় নাই—সেখানে ধর্ম থাকে না, মেয়েদের ইজ্জত-আব্রু থাকে না, এ-কথা সে বহুবার শুনিয়াছে।

গফুর কহিল, দেরি করিস্‌নে মা, চল্‌, অনেক পথ হাঁটতে হবে।

আমিনা জল খাইবার ঘটি ও পিতার ভাত খাইবার পিতলের থালাটি সঙ্গে লইতেছিল, গফুর নিষেধ করিল, ওসব থাক মা, ওতে আমার মহেশের প্রাচিত্তির হবে।

অন্ধকার গভীর নিশীথে সে মেয়ের হাত ধরিয়া বাহির হইল। এ-গ্রামে আত্মীয় তাহার ছিল না, কাহাকেও বলিবার কিছু নাই। আঙিনা পার হইয়া

পথের ধারে সেই বাবলাতলায় আসিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া সহসা হুহু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। নক্ষত্রখচিত কালো আকাশে মুখ তুলিয়া বলিল, আল্লা! আমাকে যত খুশি সাজা দিও, কিন্তু মহেশ আমার তেষ্টা নিয়ে মরেচে। তার চরে খাবার এতটুকু জমি কেউ রাখেনি। যে তোমার দেয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয়নি, তার কসুর তুমি যেন কখনো মাপ কোরো না।

পুঁই মাচা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সহায়হরি চাটুয্যে উঠানে পা দিয়েই স্ত্রীকে বলিলেন—একটা বড় বাটি কি ঘটি যা হয় কিছু দাও তো, তারক খুড়ো গাছ কেটেছে, একটু ভালো রস আনি।

স্ত্রী অন্নপূর্ণা খড়ের রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া শীতকালের সকালবেলা নারিকেল তেলের বোতলে ঝাঁটার কাটি পুরিয়া দুই আঙুলের সাহায্যে ঝাঁটার কাটিলগ্ন জমানো তৈলটুকু সংগ্রহ করিয়া চুলে মাখাইতেছিলেন। স্বামীকে দেখিয়া তাড়িতাড়ি গায়ের কাপড় একটু টানিয়া দিলেন মাত্র, কিন্তু বাটি কি ঘটি বাহির দিবার জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহ তো দেখাইলেনই না, এমনকি বিশেষ কোনো কথাও বলিলেন না।

সহায়হরি অগ্রবর্তী হইয়া বলিলেন—কী হয়েছে, বসে রইলে যে? দাও না একটা ঘটি? আহ ক্ষেন্তি-টেন্তি সব কোথায় গেল এরা? তুমি তেল মেখে বুঝি ছোঁবে না?

অন্নপূর্ণা তেলের বোতলটি সরাইয়া স্বামীর দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, পরে অত্যন্ত শান্ত সুরে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি মনে-মনে কী ঠাউরেছ বলতে পারো?

স্ত্রীর অতিরিক্ত রকমের শান্ত সুরে সহায়হরির মনে ভীতির সঞ্চার হইল—ইহা -যে ঝড়ের অব্যবহতি পূর্বের আকাশের স্থিরভাব মাত্র, তাহা বুঝিয়া তিনি মরিয়া হইয়া ঝড়ের প্রতীক্ষায় রহিলেন। একটু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিলেন—কেন...কী আবার ...কী

অন্নপূর্ণা পূর্বাপেক্ষাও শান্তসুরে বলিলেন—দেখ, রঙ্গ কোরো না বলছি—ন্যাকামি করতে হয় অন্য সময় কোরো। তুমি কিছু জানো না, না কি খোঁজ রাখো না? অতবড় মেয়ে যার ঘরে, সে মাছ ধরে আর রস খেয়ে দিন কাটায় কী করে তা বলতে পারো? গাঁয়ে কী গুজব রটেছে জানো?

সহায়হরি আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন– কেন? কী গুজব?

–কী গুজব জিজ্ঞাসা করো গিয়ে চৌধুরীদের বাড়ি। কেবল বাগ্‌দী দুলে–পাড়ায় ঘুরে ঘুরে জন্ম কাটালে ভদ্দরলোকের গাঁয়ে বাস করা যায় না। সমাজে থাকতে হলে সেইরকম মেনে চলতে হয়।

সহায়হরি বিস্মিত হইয়া কী বলিতে যাইতেছিলেন, অন্নপূর্ণা পূর্ববৎ সুরেই পুনর্বার বলিয়া উঠিলেন–একঘরে করবে গো তোমাকে একঘরে করবে, কাল চৌধুরীদের চণ্ডীমণ্ডপে এসব কথা হয়েছে। আমাদের হাতে ছোঁয়া জল আর কেউ খাবে না। আশীবার্দ হয়ে মেয়ের বিয়ে হল না–ও নাকি উচ্ছুগু করা মেয়ে–গাঁয়ের কোনো কাজে তোমাকে আর কেউ যেতে বলবে না–যাও ভালোই হয়েছে তোমার। এখন গিয়ে দুলে–বাড়ি বাগ্‌দী–বাড়ি উঠে বসে দিন কাটাও।

সহায়হরি তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন–এই! আমি বলি, না-জানি কী ব্যাপার। একঘরে! সবাই একঘরে করেছেন, এবার বাকি আছেন কালীময় ঠাকুর!–

ওহ্!...

অন্নপূর্ণা তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন–কেন, তোমাকে একঘরে করতে বেশিকিছু লাগে নাকি? তুমি কি সমাজের মাথা না একজন মাতব্বর লোক? চাল নেই চুলো নেই, এক কড়ার মুরোদ নেই, চৌধুরীরা তোমায় একঘরে করবে তা আর এমন কঠিন কথা কী? –আর সত্যিই তো এদিকে ধাড়ী মেয়ে হয়ে উঠল।... হঠাৎ স্বর নামাইয়া বলিলেন–হল যে পনেরো বছরের, বাইরে কমিয়ে বলে বেড়ালে কী হবে, লোকের চোখ নেই?...পুনরায় গলা উঠাইয়া বলিলেন–না বিয়ে দেবার গা, না কিছু। আমি কি যাব পাত্তর ঠিক করতে।

সশরীরে যতক্ষণ স্ত্রীর সম্মুখে বর্তমান থাকিবেন, স্ত্রীর গলার সুর ততক্ষণ কমিবার কোনো সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া সহায়হরি দাওয়া হইতে তাড়াতাড়ি একটি কাঁসার বাটি উঠাইয়া লাইয়া খিড়কী-দুয়ার লক্ষ্য করিয়া যাত্রা করিলেন; কিন্তু খিড়কী-দুয়ারের একটু এদিকে কী দেখিয়া হঠাৎ থামিয়া গেলেন এবং আনন্দপূর্ণস্বরে বলিয়া উঠিলেন–এসব কী রে? ক্ষেন্তি মা, এসব কোথা থেকে আনলি? ওহ্! এ যে...

চৌদ্দ-পনেরো বছরের একটি মেয়ে আর দুটি ছোট ছোট মেয়ে পিছনে লইয়া বাড়ি ঢুকিল। তাহার হাতে একবোঝা পুঁইশাক, ডাঁটাগুলি মোটা ও হল্‌দে হল্‌দে, চেহারা দেখিয়া মনে হয় কাহারা পাকা পুঁইগাছ উপড়াইয়া ফেলিয়া উঠানের জঙ্গল তুলিয়া দিতেছিল; মেয়েটি তাহাদের উঠানের জঞ্জাল প্রাণপণে তুলিয়া আনিয়াছে। ছোট মেয়েদুটির মধ্যে একজনের হাত খালি, অপরটির

হাতে গোটা দুই-তিন পুঁইপাতা জড়ানো কোনো দ্রব্য।

বড়মেয়েটি খুব লম্বা, গোলগাল চেহারা, মাথার চুলগুলো রুক্ষ ও অগোছালো-বাতাসে উড়িতেছে, মুখখানা খুব বড়, চোখদুটো ডাগর ডাগর ও শান্ত। সরু সরু কাচের চুড়িগুলো দু-পয়সা ডজনের একটি সেফটিপিন দিয়া একত্র করিয়া আটকানো। পিনটার বয়স খুঁজিতে যাইলে প্রাগৈতিহাসিক যুগে গিয়া পড়িতে হয়। এই বড়মেয়েটির নামই বোধ হয় ক্ষেন্তি, কারণ সে তাড়াতাড়ি পিছন ফিরিয়া তাহার পশ্চাদ্বর্তিনীর হাত হইতে পুঁইপাতা জড়ানো দ্রব্যটি লইয়া মেলিয়া ধরিয়া বলিল—চিংড়ি মাছ বাবা। গয়া খুড়ীর কাছ থেকে রাস্তায় নিলাম, দিতে চায় না, বলে—তোমার বাবার কাছে আর দিনকার দরুন দুটো পয়সা বাকি আছে। আমি বললাম—দাও গয়া পিসি, আমার বাবা কি তোমার দুটো পয়সা নিয়ে পালিয়ে যাবে—আর এই পুঁই শাকগুলো— ঘাটের ধারের রায় কাকা বললে, নিয়ে যা...কেমন মোটা মোটা...

অন্নপূর্ণা দাওয়া হইতেই অত্যন্ত ঝাঁজের সহিত চিৎকার করিয়া উঠিলেন—নিয়ে যা, আহা কী অমর্তই তোমাকে তারা দিয়েছে...পাকা পুঁইডাঁটা কাঠ হয়ে গিয়েছে, দু-দিন পরে ফেলে দিত...নিয়ে যা... আর উনি তাদের আগাছা উঠিয়ে নিয়ে এসেছেন—ভালোই হয়েছে, তাদের আর নিজেদের কষ্ট করে কাটতে হল না.. যত পাথুরে বোকা সব মরতে আসে আমার ঘাড়ে ...ধাড়ী মেয়ে, বলে দিয়েছি না তোমায় বাড়ির বাইরে কোথাও পা দিও না! লজ্জা করে না এ-পাড়া সে-পাড়া করে বেড়াতে! বিয়ে হলে যে চারছেলের মা হতে! খাওয়ার নামে আর জ্ঞান থাকে না, না?... কোথায় শাক, কোথায় বেগুন, আর একজন বেড়াচ্ছেন কোথায় রস, কোথায় ছাই, কোথায় পাঁশ—ফ্যাল্ বলছি ওসব... ফ্যাল।...

মেয়েটি শান্ত অথচ ভয়-মিশ্রিত দৃষ্টিতে মা'র দিকে চাহিয়া হাতের বাঁধন আলগা করিয়া দিল, পুঁইশাকের বোঝা মাটিতে পড়িয়ে গেল। অন্নপূর্ণা বকিয়া চলিলেন—যা তো রাধী, ও আপদগুলো টেনে খিড়কির পুকুরের ধারে ফেলে দিয়ে আয় তো—যা, ফের যদি বাড়ির বার হতে দেখেছি, তবে ঠ্যাং যদি খোঁড়া না করি তো...

বোঝা মাটিতে পড়িয়া গিয়েছিল। ছোটমেয়েটি কলের পুতুলের মতোন সেগুলি তুলিয়া লইয়া খিড়কি অভিমুখে চলিল, কিন্তু ছোটমেয়ে অতবড় বোঝা আঁকড়াইতে পারিল না, অনেকগুলি ডাঁটা এদিকে-ওদিকে ঝুলিতে ঝুলিতে চলিল।... সহায়হরির ছেলেমেয়েরা তাহাদের মাকে অত্যন্ত ভয় করিত।

সহায়হরি আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিতে গেলেন—তা এনেছে ছেলেমানুষ খাবে বলে..তুমি আবার...বরং...

পুঁইশাপের বোঝা লইয়া যাইতে যাইতে ছোটমেয়েটি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মা'র মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—না না, নিয়ে যা, খেতে হবে না—মেয়েমানুষের আবার অত নোলা কিসের? একপাড়া থেকে আর-একপাড়ায় নিয়ে আসবে দুটো পাকা পুঁইশাক ভিক্ষে করে! যা, যা তুই যা, দূর করে বনে দিয়ে আয়...

সহায়হরি বড়মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন তাহার চোখদুটা জলে ভরিয়া আসিয়াছে। তাহার মনে বড় কষ্ট হইল। কিন্তু মেয়ের যতই সাধের জিনিশ হোক, পুঁইশাকের পক্ষাবলম্বন করিয়া দুপুরবেলা স্ত্রীকে চটাইতে তিনি আদৌ সাহসী হইলেন না। নিঃশব্দে খিড়কি-দোর দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

বসিয়া রাঁধিতে বাঁধিতে বড়মেয়ের মুখের কাতর দৃষ্টি স্মরণে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে অন্নপূর্ণার মনে পড়িল—গত অরন্ধনের পূর্বদিন বাড়িতে পুঁইশাক রান্নার সময় ক্ষেন্তি আবদার করিয়া বলিয়াছিল—মা অর্ধেকগুলো কিন্তু একা আমার, অর্ধেক সব মিলে তোমাদের!

বাড়িতে কেহ ছিল না, তিনি নিজে গিয়া উঠানের ও খিড়কি-দোরের আশেপাশে যে ডাঁটা পড়িয়াছিল, সেগুলি কুড়াইয়া লইয়া আসিলেন—বাকিগুলো কুড়ানো যায় না, ডোবার ধারের ছাই-গাদায় ফেলিয়া দিয়াছে। কুঁচো চিংড়ি দিয়া এইরূপে চুপিচুপিই পুঁইশাকের তরকারি রাঁধিলেন।

দুপুরবেলা ক্ষেন্তি পাতে পুঁইশাকের চচ্চড়ি দেখিয়া বিস্ময় ও আনন্দপূর্ণ ডাগর-চোখে মায়ের দিকে ভয়ে-ভয়ে চাহিল। দু-একবার এদিকে -ওদিকে ঘুরিয়া আসিতেই অন্নপূর্ণা দেখিলেন উক্ত পুঁইশাকের একটুকরাও তাহার পাতে পড়িয়া নাই। পুঁইশাকের উপর তাঁহার এই মেয়েটির কিরূপ লোভ তাহা তিনি জানিতেন, জিজ্ঞাসা করিলেন—কিরে ক্ষেন্তি, আর–একটু চচ্চড়ি দিই? ক্ষেন্তি তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িয়ে এ আনন্দজনক প্রস্তাব সমর্থন করিল। কী ভাবিয়া অন্নপূর্ণার চোখে জল আসিল, চাপিতে গিয়া তিনি চোখ উঁচু করিয়া চালের বাতায় গোঁজা ডালা হইতে শুকনা লঙ্কা পাড়িতে লাগিলেন। কালীময়ের চণ্ডীমণ্ডপে সেদিন বৈকালবেলা সহায়হরির ডাক পড়িল। সংক্ষিপ্ত ভূমিকা ফাঁদিবার পর কালীময় উত্তেজিত সুরে বলিনের—সেসব দিন কি আর আছে ভায়া? এই ধরো কেষ্ট মুখুয্যে...'স্বভাব নইলে পাত্রে দেব না, স্বভাব নইলে পাত্রে দেব না' করে কী কাণ্ডটাই করলে—অবশেষে কিনা হরির ছেলেটাকে ধরে পড়ে, মেয়ের বিয়ে দেয় তবে রক্ষে! তার কী স্বভাব? রাম বলো, ছ-সাত পুরুষে ভঙ্গ, পচা শ্রোত্রীয়!—পরে সুর নরম করিয়া বলিলেন, তা সমাজের সেসব শাসনের দিন কি আর আছে? দিন দিন চলে যাচ্ছে। বেশিদূর যাই কেন, এই যে তোমার মেয়েটি তেরো বছরের...

সহায়হরি বাধা দিয়া বলিতে গেলেন—এই শ্রাবণে তেরোয়...

—আহা-হা, তেরোয় আর ষোলোয় তফাৎ কিসের শুনি? তেরোয় আর ষোলের তফাৎটা কিসের? আর সে তেরোই হোক, চাই ষোলেই হোক, চাই পঞ্চাশই হোক, তাতে আমাদের দরকার নেই, সে তোমার হিশেব তোমার কাছে। কিন্তু পাত্তর আশীর্বাদ হয়ে গেল, তুমি বেঁকে বসলে কী জন্যে শুনি? ও তো এরকম উচ্ছুগু করা মেয়ে। আশীর্বাদ হওয়াও যা, বিয়ে হওয়াও তা; সাতপাকের যা বাকি, এই তো?...সমাজে বসে এসব কাজগুলো তুমি যে করবে আর আমরা বসে বসে দেখব, এ তুমি মনে ভেবো না। সমাজের বামুনদের যদি জাত মারবার ইচ্ছে না থাকে মেয়ের বিয়ের বন্দোবস্ত করে ফ্যালো।...পাত্তর পাত্তর! রাজপুত্তুর না হলে কি পাত্তর মেলে না?...গরিব মানুষ, দিতে-থুতে পারবে না বলেই শ্রীমন্ত মজুমদারের ছেলেকে ঠিক করে দিলাম। লেখাপড়া নাই বা জানলে? জজ-মেজেস্টার না হলে কি মানুষ হয় না? দিব্যি বাড়ি বাগান পুকুর—শুনলাম এবার নাকি কুঁড়ির জমিতে চাট্টি আমন ধানও করেছে, ব্যস্—রাজার হাল! দুই ভাইয়ের অভাব কি?...

ইতিহাসটা হইতেছে যে, মণিগাঁয়ের উক্ত মজুমদার মহাশয়ের পুত্রটি কালীময়ই ঠিক করিয়া দেন। কেন কালীময় মাথাব্যথা করিয়া সহায়হরির মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ মজুমদার মহাশয়ের ছেলের সঙ্গে ঠিক করিতে গেলেন, তাহার কারণ নির্দেশ করিতে যাইয়া কেহ কেহ বলেন যে, কালীময় নাকি মজুমদার মহাশয়ের কাছে অনেক টাকা ধারেন, অনেকদিনের সুদ পর্যন্ত বাকি—শীঘ্র নালিশ হইবে, ইত্যাদি। এ গুজব-যে শুধু অবান্তর তাহাই নহে, ইহার কোনো ভিত্তি আছে বলিয়াও মনে হয় না। ইহা দুষ্টপক্ষের রটনা মাত্র। যাহাই হউক, পাত্রপক্ষ আশীর্বাদ করিয়া যাওয়ার দিনকতক পরে সহায়হরি টের পান, পাত্রটি কয়েকমাস পূর্বে নিজের গ্রামে কী একটা করিবার ফলে গ্রামের এক কুম্ভকার-বধূর আত্মীয়স্বজনের হাতে বেদম প্রহার খাইয়া কিছুদিন নাকি শয্যাগত ছিল। এরকম পাত্রে মেয়ে দিবার প্রস্তাব মনঃপূত না-হওয়ায় সহায়হরি সে-সম্বন্ধ ভাঙিয়া দেন।

দিন দুই-পরের কথা। সকালে উঠিয়া সহায়হরি উঠানে বাতাবিলেবু গাছের ফাঁক দিয়া যেটুকু নিতান্ত কচি রাঙা রৌদ্র আসিয়াছিল, তাহারই আতপে বসিয়া আপনমনে তামাক টানিতেছেন। বড়মেয়ে ক্ষেন্তি আসিয়া চুপি চুপি বলিল—বাবা, যাবে না? মা ঘাটে গেল...

সহায়হরি একবার বাড়ির পাশে ঘাটের পথের দিকে কী জানি কেন চাহিয়া দেখিলেন, পরে নিম্নস্বরে বলিলেন—যা শিগগির শাবলখানা নিয়ে আয়

দিকি!—কথা শেষ করিয়া তিনি উৎকণ্ঠার সহিত জোরে জোরে তামাক টানিতে লাগিলেন এবং পুনরায় একবার কী জানি কেন খিড়কির দিকে সতর্কদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ইতিমধ্যে প্রকাণ্ড বাড়ি একটা লোহার শাবল দুইহাত দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া ক্ষেন্তি আসিয়া পড়িল—তৎপরে পিতা-পুত্রীতে সন্তর্পণে সম্মুখের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল। ইহাদের ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল—ইহারা কাহারো ঘরে সিঁধ দিবার উদ্দেশ্যে চলিয়াছে।

অন্নপূর্ণা স্নান করিয়া সবে কাপড় ছাড়িয়া উনুন ধরাইবার জোগাড় করিতেছেন, মুখুয্যে বাড়ির ছোট খুকি দুর্গা আসিয়া বলিল—খুড়ীমা মা বলে দিলে, খুড়ীমাকে গিয়ে বল্ মা ছোঁবে না, তুমি আমার নবান্নটা মেখে আর ইতুর ঘটগুলো বার করে দিয়ে আসবে?

মুখুয্যে-বাড়ি ও-পাড়ায়—যাইবার পথের বাঁ-ধরে একজায়গায় শেওড়া, বনভাঁট, রাংচিতা, বনচাল্‌তা গাছের ঘন বন। শীতের সকালে একপ্রকার লতাপাতার ঘন গন্ধ বন হইতে বাহির হইতেছিল। একটা লেজ-ঝোলা হলদে পাখি আমড়াগাছের এ-ডাল হইতে ও-ডালে যাইতেছে।

দুর্গা আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—খুড়ীমা, খুড়ীমা ঐ যে কেমন পাখিটা!—পাখি দেখিতে গিয়া অন্নপূর্ণা কিন্তু আর একটা জিনিস লক্ষ করিলেন। ঘন বনটার মধ্যে কোথায় এতক্ষণ খুপ্ খুপ্ করিয়া একটা আওয়াজ হইতেছিল...কে যেন কী খুঁড়িতেছে...দুর্গার কথার পরেই হঠাৎ সেটা বন্ধ হইয়া গেল। অন্নপূর্ণা সেখানে খানিকক্ষণ থমকিয়া দাঁড়াইলেন, পরে চলিতে আরম্ভ করিলেন। তাহারা খানিকদূর যাইতে-না-যাইতে বনের মধ্যে পুনরায় খুপ্ খুপ্‌শব্দ আরম্ভ হইল।

কাজ করিয়া ফিরিতে অন্নপূর্ণার কিছু বিলম্ব হইল। বাড়ি ফিরিয়া দেখিলেন, ক্ষেন্তি উঠানের রৌদ্রে বসিয়া তেলের বাটি সম্মুখে লইয়া খোঁপা খুলিতেছে। তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মেয়ের দিকে চাহিয়া দেখিয়া রান্নাঘরে গিয়া উনুন ধরাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। মেয়েকে বলিলেন—এখনও নাইতে যাসনি যে, কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

ক্ষেন্তি তাড়াতাড়ি উত্তর দিল—এই যে যাই মা, এক্ষুনি যাব আর আসব।

ক্ষেন্তি স্নান করিতে যাইবার একটুখানি পরেই সহায়হরি সোৎসাহে পনেরো-ষোলো সের ভারী একটা মেটে আলু ঘাড়ে করিয়া কোথায় হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সম্মুখে স্ত্রীকে দেখিয়া কৈফিয়তের দৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিয়াই বলিয়া উঠিলেন—ওই ও-পাড়ার ময়শা চৌকিদার রোজই বলে—কর্তা-ঠাকুর, তোমার বাপ থাকতে তবু মাসে মাসে এদিকে তোমাদের

পায়ের ধুলো পড়ত, তা আজকাল তো তোমরা আর আসো না, এই বেড়ার গায়ে মেটে আলু করে দেখেছি, তা দাদাঠাকুর বরং...

অন্নপূর্ণা স্থিরদৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—বরোজপোতার বনের মধ্যে বসে খানিক আগে কী করছিলে শুনি?

সহায়হরি অবাক হইয়া বলিলেন—আমি! না আমি কখন? কক্ষনো না, এই তো আমি...সহায়হরির ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল তিনি এইমাত্র আকাশ হইতে পড়িয়াছেন।

অন্নপূর্ণা পূর্বের মতোই স্থিরদৃষ্টির স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—চুরি তো করবেই, তিন কাল গিয়েছে এক কাল আছে, মিথ্যা কথাগুলো আর এখন বোলো না।...আমি সব জানি। মনে ভেবেছিলে আপণ ঘাটে গিয়েছে আর কী...দুর্গার মা ডেকে পাঠিয়েছিল, ও-পাড়ায় যাচ্ছি, শুনলাম বরোজপোতার বনের মধ্যে কীসব খুপ্ খুপ্ শব্দ...তখনই আমি বুঝতে পেরেছি, সাড়া পেয়ে শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। যেই আবার খানিকদূর গোলাম আবার দেখি শব্দ...তোমার তো ইহকালও নেই, পরকালও নেই, চুরি করতে ডাকাতি করতে, যা ইচ্ছে করো, কিন্তু মেয়েটাকে আবার এর মধ্যে নিয়ে গিয়ে ওর মাথায় খাওয়া কিসের জন্যে?

সহায়হরি হাত নাড়িয়া, বরোজপোতায় তাঁহার উপস্থিত থাকার বিরুদ্ধে কতকগুলি প্রমাণ উত্থাপন করিবার চেষ্টা করিতে গেলেন; কিন্তু স্ত্রীর চোখের দৃষ্টির সামনে তাঁহার বেশি কথাও জোগাইল না বা কথিত উক্তিগুলির মধ্যে কোনো পৌর্বাপর্য সম্বন্ধেও খুঁজিয়া পাওয়া গেলে না।...

আধঘণ্টা পরে ক্ষেন্তি স্নান সারিয়া বাড়ি ঢুকিল। সম্মুখস্থ মেটে আলুর দিকে একবার আড়চোখ চাহিয়াই নিরীহমুখে উঠানের আলনায় অত্যন্ত মনোযোগের সহিত কাপড় মেলিয়া দিতেছিল।

অন্নপূর্ণা ডাকিলেন—ক্ষেন্তি এদিকে একবার আয় তো, শুনে যা...

মায়ের ডাক শুনিয়া ক্ষেন্তির মুখ শুকাইয়া গেল—সে ইতস্তত করিতে করিতে মা'র নিকট আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—এই মেটে আলুটা দুজনে মিলে তুলে এনেছিস না?

ক্ষেন্তি মা'র মুখের দিকে একটুখানি চাহিয়া থাকিয়া একবার ভূপতিত মেটে আলুটার দিকে চাহিল, পরে পুনরায় মা'র মুখের দিকে চাহিয়া লইল; তাহার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল, কিন্তু মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

অন্নপূর্ণা কড়া সুরে বলিলেন—কথা বলছিস নে যে বড়? এই মেটে আলু তুই এনেছিস কিনা?

ক্ষেন্তি বিপন্ন-চোখে মা'র মুখের দিকেই চাহিয়াছিল, উত্তর দিল—হ্যাঁ।

অন্নপূর্ণা তেল-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন—পাজি, আজ তোমার পিঠে আমি আস্ত কাঠের চেলা ভাঙব তবে ছাড়ব, বরোজপোতার বনে গিয়েছ মেটে আলু চুরি করতে? সোমত্ত মেয়ে, বিয়ের যুগ্যি হয়ে গেছে কোন্ কালে, সেই একগলা বিজন বন, তার মধ্যে দিনদুপুরে বাঘ লুকিয়ে থাকে, তার মধ্যে থেকে পরের আলু নিয়ে এল তুলে! যদি গোসাঁইরা চৌকিদার ডেকে তোমায় ধরিয়ে দেয়? তোমার কোন্ শ্বশুর এসে তোমায় বাঁচাত? আমার জোটে খাব, না-জোটে না-খাব, তা বলে পরের জিনিসে হাত? এ মেয়ে নিয়ে আমি কী করব, মা?

দু-তিনদিন পরে একদিন বৈকালে ধুলামাটি মাখা হাতে ক্ষেন্তি মাকে আসিয়া বলিল—মা মা, দেখবে এসো...

অন্নপূর্ণা গিয়া দেখিলেন, ভাঙা পাঁচিলের ধারে যে ছোট খোলা জমিতে কতকগুলা পাথরকুঁচি ও বণ্টিকারীর জঙ্গল হইয়াছিল, ক্ষেন্তি ছোটবোনটিকে লইয়া সেখানে মহাউৎসাহে তরকারির আওলাত করিবার আয়োজন করিতেছে এবং ভবিষ্যসম্ভাবী নানাবিধ কাল্পনিক ফলমূলের অগ্রদূত-স্বরূপ বর্তমানে কেবল একটিমাত্র শীর্ণকায় পুঁইশাকের চারা কাপড়ের ফালির গ্রন্থি-বন্ধনে বন্ধ হইয়া ফাঁসি হইয়া যাওয়া আসামির মতোন ঊর্ধ্বমুখে একখণ্ড শুষ্ক কঞ্চির গায়ে ঝুলিয়া রহিয়াছে। ফলমূলাদির অবশিষ্টগুলি আপাতত তাঁর বড়মেয়ের মস্তিষ্কের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে, দিনের আলোয় এখনও বাহির হয় নাই।

অন্নপূর্ণা হাসিয়া বলিলেন, দূর পাগলী, এখন পুঁইডাটার চারা পোঁতে কখনো? বর্ষাকালে পুঁততে হয়। এখন যে জল না-পেয়ে মরে যাবে!

ক্ষেন্তি বলিল—কেন, আমি রোজ জল ঢালব?

অন্নপূর্ণা বলিলেন—দ্যাখ্, হয়তো বেঁচে যেতে পারে! আজকাল রাতে খুব শিশির হয়।

খুব শীত পড়িয়াছে। সকালে উঠিয়া সহায়হরি দেখিলেন, তাঁহার দুই ছোটমেয়ে দোলাই গায়ে বাঁধিয়া রোদ উঠিবার প্রত্যাশায় উঠানে কাঁঠালতলায় দাঁড়াইয়া আছে। একটা ভাঙা ঝুড়ি করিয়া ক্ষেন্তি শীতে কাঁপিতে কাঁপতে মুখুয্যেবাড়ি হইতে গোবর কুড়াইয়া আনিল। সহায়হরি বলিলেন—হাঁ মা ক্ষেন্তি, তা সকালে উঠে জামাটা গায় দিতে তোর কী হয়? দেখ দিকি, এই শীত।

—আমি দিচ্ছি বাবা, কই শীত, তেমন তো...

—হ্যাঁ, দে মা, এক্ষুনি দে—অসুখ-বিসুখ পাঁচরকম হতে পারে বুঝলি নে?—

সহায়হরি বাহির হইয়া গেলেন, ভাবিতে ভাবিতে গেলেন, তিনি কি অনেকদিন মেয়ের মুখে ভালো করিয়া চাহেন নাই? ক্ষেন্তির মুখ এমন সুশ্রী হইয়া উঠিয়াছে!

জামার ইতিহাস নিম্নলিখিতরূপ

বহু বৎসর অতীত হইল, হরিপুরের রাসের মেলা হইতে সহায়হরি কালো সার্জের এই আড়াই টাকা মূল্যের জামাটি ক্রয় করিয়া আসেন। ছিঁড়িয়া যাইবার পর তাহাতে কতবার রিপু ইত্যাদি করা হইয়াছিল, সম্প্রতি গত বৎসর হইতে ক্ষেন্তির স্বাস্থ্যোন্নতি হওয়ার দরুন জামাটি তাহার গায়ে হয় না। সংসারের এসব খোঁজ সহায়হরি কখনও রাখিতেন না। জামার বর্তমান অবস্থা অন্নপূর্ণারও জানা ছিল না—ক্ষেন্তির নিজস্ব ভাঙা টিনের তোরঙ্গের মধ্যেই উহা থাকিত।

পৌষ-সংক্রান্তি। সন্ধ্যাবেলা অন্নপূর্ণ একটা কাঁসিতে চালের গুঁড়া, ময়দা ও গুড় দিয়া চটকাইতেছিলেন—একটি ছোট বাটিতে একবাটি তেল। ক্ষেন্তি কুরুনির নিচে একটা কলার পাতা পাড়িয়া এক মালা নারিকেল কুরিতেছে। অন্নপূর্ণা প্রথমে ক্ষেন্তির সাহায্য লইতে স্বীকৃত হন নাই, কারণ সে যেখানে-সেখানে বসে, বনে-বাদাড়ে ঘুড়িয়া ফেরে, তাহার কাপড়চোপড় শাস্ত্রসম্মত ও শুচি নহে। অবশেষে ক্ষেন্তি নিতান্ত ধরিয়া পড়ায় হাতপা ধোয়াইয়া ও শুদ্ধ কাপড় পরাইয়া তাহাকে বর্তমান পদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

ময়দার গোলা মাখা শেষ হইলে অন্নপূর্ণা উনুনে খোলা চাপাইতে যাইতেছে, ছোটমেয়ে রাধা হঠাৎ ডান হাতখানা পাতিয়া বলিল—মা, ঐ একটু...

অন্নপূর্ণা বড় গামলাটা হইতে একটুখানি গোলা তুলিয়া লইয়া হাতের আঙুল পাঁচটি দ্বারা একটি বিশেষ মুদ্রা রচনা করিয়া সেটুকু রাধার প্রসারিত হাতের উপর দিলেন। মেজোমেয়ে পুঁটি অমনি ডান হাতখানা কাপড়ে তাড়াতাড়ি মুছিয়া লইয়া, মার সামনে পাতিয়া বলিল—মা, আমায় একটু...

ক্ষেন্তি শুচিবস্ত্রে নারিকেল কুরিতে কুরিতে লুব্ধনেত্রে মধ্যে মধ্যে এদিকে চাহিতেছিল, এ-সময় খাইতে চাওয়ায় মা পাছে বকে, সেই ভয়ে চুপ করিয়া রহিল।

অন্নপূর্ণা বলিলেন—দেখি, নিয়ে আয় ক্ষেন্তি ঐ নারকেল মালাটা, ওতে তোর জন্যে একটু রাখি।...ক্ষেন্তি ক্ষিপ্ত হস্তে নারিকেলের উপরের মালাখানা, যাহাতে ফুটা নাই, সেখানা সরাইয়া দিল, অন্নপূর্ণা তাহাতে একটু বেশি করিয়া গোলা ঢালিয়া দিলেন।

মেজোমেয়ে পুঁটি বলিল—জেঠাইমারা অনেকখানি দুধ নিয়েছে, রাঙাদিদি ক্ষীর তৈরি করছিল, ওদের অনেক রকম হবে।

ক্ষেন্তি মুখ তুলিয়া বলিল—এ-বেলা আবার হবে নাকি? ওরা তো ও-বেলা ব্রাহ্মণ নেমতন্ন করেছিল সুরেশ কাকাকে আর ও-পাড়ার তিনুর বাবাকে। ও-বেলা তো পায়েশ, ঝোল-পুলি, মুগতক্তি এইসব হয়েছে।

পুঁটি জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁ মা, ক্ষীর নইলে নাকি পাটিসাপ্টা হয় না? খেঁদি বলছিল, ক্ষীরের পূর না হলে কি আর পাটিসাপ্টা হয়? আমি বললাম, কেন আমার মা তো শুধু নারকেলের ছাঁই দিয়ে করে, সে তো কেমন লাগে!

অন্নপূর্ণা বেগুনের বোঁটায় একটুখানি তেল লইয়া খোলায় মাখাইতে মাখাইতে প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজিতে লাগিলেন।

ক্ষেন্তি বলিল—খেঁদির ওইসব কথা! খেঁদির মা তো ভারি পিঠে করে কিনা? ক্ষীরের পূর দিয়ে ঘিয়ে ভাজলেই কি আর পিঠে হল? সেদিন জামাই এলে ওদের বাড়ি দেখতে গেলুম কিনা, তাই খুড়ীমা দুখানা পাটিসাপ্টা খেতে দিলে। ওমা কেমন একটা ধরা-ধরা গন্ধ! আর মা'র পিঠেতে কখনো কোনো গন্ধ পাওয়া যায়! পাটিসাপটায় ক্ষীর দিলে ছাই খেতে হয়!

বেপরোয়াভাবে উপরোক্ত উক্তি শেষ করিয়া ক্ষেন্তি মা'র চোখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—মা, নারকোল-কোরা একটু নেব?

অন্নপূর্ণা বলিলেন—নে, কিন্তু এখানে বসে খাসনে। মুখ থেকে পড়বে না কী হবে, যা ঐদিকে যা।

ক্ষেন্তি নারিকেলের মাথায় একথাবা কোরা তুলিয়া লইয়া একটু দূরে গিয়া খাইতে লাগিল। মুখ যদি মনের দর্পণস্বরূপ হয়, তবে ক্ষেন্তির মুখ দেখিয়া সন্দেহের কোনো কারণ থাকিতে পারিত না যে, সে অত্যন্ত মানসিক তৃপ্তি অনুভব করিতেছে।

ঘণ্টাখানেক পরে অন্নপূর্ণা বলিলেন—ওরে, তোরা সব এক-এক টুকরো পাতা পেতে বোস তো দেখি! গরম গরম দিই। ক্ষেন্তি, জল দেওয়া ভাত আছে ও-বেলার, বার করে নিয়ে আয়।

ক্ষেন্তির নিকট অন্নপূর্ণার এ-প্রস্তাব-যে খুব মনঃপূত হইল না, তা তার মুখ দেখিয়া বোঝা গেল। পুঁটি বলিল—মা, বড়দি পিঠেই থাক। ভালোবাসে। ভাত বরং থাকুক, আমরা কাল সকালে খাব!

খানকয়েক খাইবার পরেই ছোটমেয়ে রাধা আর খাইতে চাহিল না। সে নাকি অধিক মিষ্টি খাইতে পারে না। সকলের খাওয়া শেষ হইয়া গেলেও ক্ষেন্তি তখনও খাইতেছে! সে মুখ বুজিয়া শান্তভাবে খায়, বড় একটা কথা কহে না। অন্নপূর্ণা দেখিলেন, সে কম করিয়াও আঠারো-উনিশখানা খাইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেন—ক্ষেন্তি আর নিবি?...ক্ষেন্তি খাইতে খাইতে শান্তভাবে সম্মতিসূচক

ঘাড় নাড়িল। অন্নপূর্ণা তাহাকে আরও খানকয়েক দিলেন। ক্ষেন্তির মুখচোখ ঈষৎ উজ্জ্বল দেখাইল, হাসিভরা চোখে মা'র দিকে চাহিয়া বলিল—বেশ খেতে হয়েছে, মা। ঐ যে তুমি কেমন ফেনিয়ে নেও, ওতেই কিন্তু...সে পুনরায় খাইতে লাগিল।

অন্নপূর্ণা হাতা, খুন্তি, চুলী তুলিতে তুলিতে সস্নেহে তাঁর একটু শান্ত নিরীহ একটু অধিক মাত্রায় ভোজনপটু মেয়েটির দিকে চাহিয়া রহিলেন। মনে-মনে ভাবিলেন—ক্ষেন্তি আমার যার ঘরে যাবে, তাদের অনেক সুখ দেবে। এমন ভালোমানুষ, কাজকর্মে বকো, মারো, গাল দাও, টুঁ-শব্দটি মুখে নেই, উঁচু কথা কখনো কেউ শোনেনি...

বৈশাখ মাসের প্রথমে সহায়হরির এক দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয় ঘটকালিতে ক্ষেন্তির বিবাহ হইয়া গেল। দ্বিতীয়পক্ষে বিবাহ করিলেও পাত্রটির বয়স চল্লিশের খুব বেশি কোনোমতেই হইবে না। তবুও প্রথম এখানে অন্নপূর্ণা আদৌ ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু পাত্রটি সঙ্গতিপন্ন, শহর অঞ্চলে বাড়ি, সিলেট চুন ও ইঁটের ব্যবসায়ে দু-পয়সা নাকি করিয়াছে—এরকম পাত্র হঠাৎ মেলাও বড় দুর্ঘট কি না।

জামাইয়ের বয়স একটু বেশি, প্রথমে অন্নপূর্ণা জামাইয়ের সম্মুখে বাহির হইতে একটু সংকোচ বোধ করিতেছিলেন, পরে পাছে ক্ষেন্তির মনে কষ্ট হয়, এইজন্য বরণের সময় তিনি ক্ষেন্তির সুপুষ্ট হস্তখানি ধরিয়া জামাইয়ের হাতে তুলিয়া দিলেন—চোখের জলে তাঁহার গলা বন্ধ হইয়া আসিল, কিন্তু বলিতে পারিলেন না।

বাড়ির বাহির হইয়া আমলকীতলায় বেহারার সুবিধা করিয়া লইবার জন্য বরের পালকি একবার নামাইল। অন্নপূর্ণা চাহিয়া দেখিলেন, বেড়ার ধারের নীল রঙের মেদিফুলের গুচ্ছগুলি যেখানে নত হইয়া আছে, ক্ষেন্তির কম দামের বালুচরের রাঙা চেলির আঁচলখানা পালকির বাহির হইয়া সেখানে লুটাইতেছে।...তাঁহার এই অত্যন্ত অগোছালো, নিতান্ত নিরীহ, একটু অধিকমাত্রায় ভোজনপটু মেয়েটিকে পরের ঘরে অপরিচিত মহলে পাইয়াছে তাঁর বুক উদ্বেল হইয়া উঠিতেছিল। ক্ষেন্তিকে কি অপরের ঠিক বুঝিবে?...

যাইবার সময় ক্ষেন্তি চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে সান্ত্বনার সুরে বলিয়াছিল—মা, আষাঢ় মাসেই আমাকে এনো...বাবাকে পাঠিয়ে দিও...দুটো মাস তো...

ও-পাড়ার ঠানদিদি বলিলেন—তোমার বাবা তোর বাড়ি যাবে কেন রে, আগে নাতি হোক—তবে তো...

ক্ষেন্তির মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। জলভরা ডাগর চোখের উপর একটুখানি লাজুক হাসির আভা মাখাইয়া সে একগুঁয়েমির সুরে বলিল—না, যাবে না বৈকি?...দেখো তো, কেমন না যান্!

ফাগুন-চৈত্রমাসের বৈকালবেলা উঠানের মাচায় রৌদ্রে-দেওয়া আমস তুলিতে তুলিতে অন্নপূর্ণার মন হু-হু করিত...তাঁহার অনাচারী লোভ মেয়েটি আজ বাড়িতে নাই যে, কোথা হইতে বেড়াইয়া আসিয়া লজ্জাহীনার মতোন হাতখানি পাতিয়া মিনতির সুরে অমনি বলিবে—মা, বল্‌ব একটা কথা, এই কোণটা ছিঁড়ে একটুখানি...

এক বছরের উপর হইয়া গিয়াছে। পুনরায় আষাঢ় মাস। বর্ষা বেশ নামিয়াছে। ঘরের দাওয়ায় বসিয়া সহায়হরি প্রতিবেশী বিষ্ণু সরকারের সহিত কথা বলিতেছে। সহায়হরি তামাক সাজিতে সাজিতে বলিলেন—ও তুমি ধরে রাখো, ওরকম হবেই দাদা। আমাদের অবস্থার লোকেও ওর চেয়ে ভালো কী আর জুটবে?

বিষ্ণু সরকার তালপাতার চাটাইয়ের উপর উবু হইয়া বসিয়াছিলেন, দূর হইতে দেখিলে মনে হইবার কথা, তিনি রুচি করিবার জন্য ময়দা চট্‌কাইতেছেন। গলা পরিষ্কার করিয়া বলিলেন,—নাহ্, সব তো আর..তাছাড়া আমি যা দেব নগদই দেব।...তোমার মেয়েটির হয়েছিল কী?

সহায়হরি হুঁকাটায় পাঁচ-ছটি টান দিয়া কাশিতে কাশিতে বলিলেন—বসন্ত হয়েছিল শুনলাম। ব্যাপার কী দাঁড়াল বুঝলে? মেয় তো কিছুতে পাঠাতে চায় না। আড়াইশো আন্দাজ টাকা বাকি ছিল, বললে ও টাকা আগে দাও তবে মেয়ে নিয়ে যাও।

—একেবারের চামার...

—তাপর বললাম, টাকাটা ভায়া ক্রমে-ক্রমে দিচ্ছি। পুজোর তত্ত্ব কম করেই ত্রিশটে টাকার কম হবে না ভেবে দেখলাম কিনা! মেয়ের নানা নিন্দে ওঠালে...ছোটলোকের মেয়ের মতোন চাল, হাভাতে ঘরের মতো খাই-খাই...আরও কত কী! পৌষমাসে দেখতে গেলাম—মেয়েটাকে ফেলে থাকতে পারতাম না, বুঝলে?

সহায়হরি হঠাৎ কথা বন্ধ করিয়া জোরে জোরে মিনিট-কতক ধরিয়া হুঁকায় টান দিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ দুজনের কোনো কথা শোনা গেল না।

অল্পকক্ষণ পরে বিষ্ণু সরকার বলিলেন—তারপর?

—আমার স্ত্রী অত্যন্ত কান্নাকাটি করাতে পৌষমাসে দেখতে গেলাম। মেয়েটার

যে-অবস্থা করেছে! শাশুড়িটা শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগল, না-জেনেশুনে ছোটলোকের সঙ্গে কুটুম্বিতে করলেই এরকম হয়, যেমনি মেয়ে তেমনি বাপ, পৌষ মাসের দিন মেয়ে দেখতে এলেন শুধু-হাতে!...পরে বিষ্ণু সরকারের দিকে চাহিয়া বলিলেন—বলি আমরা ছোটলোক কি বড়লোক, তোমার তো সরকার খুড়ো জানতে বাকি নেই, বলি পরমেশ্বর চাটুয্যের নামে নীলকুঠির আমলে এ-অঞ্চলে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খেয়েছে—আজই না হয় আমি...প্রাচীন আভিজাত্যের গৌরবে সহায়হরি শুষ্কসুরে হা-হা করিয়া খানিকটা শুষ্ক হাস্য করিলেন।

বিষ্ণু সরকার সমর্থনসূচক একটা অস্পষ্ট শব্দ করিয়া বারকতক ঘাড় নাড়িলেন।

—তারপর ফাগুন মাসেই তার বসন্ত হল। এমন চামার—বসন্ত গায়ে বেরুতেই টালায় আমার এক দূর-সম্পর্কের বোন আছে, একবার কালীঘাটে পুজো দিতে এসে তার খোঁজ পেয়েছিল—তারই ওখানে ফেরে রেখে গেল। আমায় না একটা সংবাদ, না কিছু। তারা আমায় সংবাদ দেয়। তা আমি গিয়ে...

—দেখতে পাওনি?

—নাহ্! এমনি চামার—গহনাগুলো অসুখ অবস্থাতেই গা থেকে খুলে নিয়ে তবে টালায় পাঠিয়ে দিয়েছে।..যাক, তা চলো, যাওয়া যাক, বেল গেল।...চার কি ঠিক করলে...পিঁপড়ের টোপে মুড়ির চার তো সুবিধে হবে না...

তারপর কয়েকমাস কাটিয়া গিয়াছে। আজ আবার পৌষ-পার্বণের দিন। এবার পৌষ মাসের শেষাশেষি এত শীত পড়িয়াছে যে অত্যন্ত বৃদ্ধ লোকেরাও বলাবলি করিতেছেন যে, এরূপ শীত তাঁহারা কখনো জ্ঞানে দেখেন নাই।

সন্ধ্যার সময় রান্নাঘরের মধ্যে বসিয়া অন্নপূর্ণা সরুচাক্‌লি পিঠার জন্য চালের গুঁড়ার গোলা তৈয়ারি করিতেছেন। পুঁটি ও রাধা উনানের পাশে বসিয়া আগুন পোহাইতেছে।

রাধা বলিতেছে—আর একটু জল দিতে হবে মা, অত ঘর করে ফেললে কেন।

পুঁটি বলিল—আচ্ছা মা ওতে একটু নুন দিলে হয় না?

—ওমা দেখ মা, রাধার দোলাই কোথায় ঝুলছে, এখুনি ধরে উঠবে...

অন্নপূর্ণ বলিয়া উঠিলেন—সরে এসে বসো না, আগুনের ঘাড়ে গিয়ে না বসলে কি আগুন পোহানো হয় না? এদিকে আয়।

গোলা তৈয়ারি হইয়া গেল,...খোলা আগুনে চড়াইয়া অন্নপূর্ণা গোলা ঢালিয়া মুচি দিয়া চাপিয়া ধরিলেন...দেখিতে দেখিতে মিঠে-আঁচে পিঠা। টোপরের মতোন ফুলিয়া উঠিল।

পুঁটি বলিল—মা দাও, প্রথম পিছনে ষাঁড়া-গাছের ঝোপের মাথায় তেলাকুচো লতার থোলো থেলো শাদা ফুলের মধ্যে জোছনা আটকিয়া রহিয়াছে।...

পুঁটি ও রাধা খিড়কি-দোর খুলিতেই একটা শিয়াল শুকনো পাতায় খস্‌খস্ শব্দ করিতে করিতে ঘন ঝোপের মধ্যে ছুটিয়া পলাইল। পুঁটি পিঠাখানা জোর করিয়া ছুড়িয়া ঝোপের মাথায় ফেলিয়া দিল। তাহার পর চারিধারের নির্জন বাঁশবনের নিস্তব্ধতায় ভয় পাইয়া ছেলেমানুষ পিছু হটিয়া আসিয়া খিড়কি-দরজার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া তাড়াতাড়ি দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

পুঁটি ও রাধা ফিরিয়া আসিলে অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন—দিল্লি?

পুঁটি বলিল—হ্যাঁ মা তুমি আর-বছর যেখানে থেকে নেবুর চারা তুলে এনেছিলে সেখানে ফেলে দিলাম...

তারপর সে-রাত্রে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। পিঠে গড়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে...রাতও তখন খুব বেশি।...জোছনার আলোয় বাড়ির ফিচনের বনে অনেকক্ষণ ধরিয়া একটা কাঠ্‌ঠোকরা পাখি ঠক্-র্-র্-র্ শব্দ করিতেছিল, তাহার স্বরটাও যেন ক্রমে তন্দ্রালু হইয়া পড়িতেছে...দুই বোনের খাইবার জন্য কলার পাতা চিরিতে চিরিতে পুঁটি অন্যমনস্কভাবে হঠাৎ বলিয়া উঠিল—দিদি বড় ভালোবাসত...

তিনজনেই খালিনক্ষণ নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর তাহাদের তিনজনেরই দৃষ্টি কেমন করিয়া আপনাআপনি উঠানের এককোণে আবদ্ধ হইয়া পড়িল...যেখানে বাড়ির সেই লোভী মেয়েটির লোভের স্মৃতি পাতায়-পাতায় শিরায়-শিরায় জড়াইয়া তাহার কত সাধের নিজের-হাত-পোঁতা পুঁইগাছটি মাচা জুড়িয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে। বর্ষার জল ও কার্তিক মাসের শিশির লইয়া. কচি-কচি সবুজ ডগাগুলি মাচাতে সব ধরে নাই, মাছা হইতে বাহির হইয়া দুলিতেছে...সুপুষ্ট, নধর, প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর!...

রিলিফ ওয়ার্ক্

আবুল মনসুর আহমদ

বন্যা।

সারা দেশ ভাসিয়া গিয়াছে। গ্রামকে গ্রাম ধু ধু করিতেছে। বিস্তীর্ণ জলরাশির কোথাও কোথাও ঘরের চাল ও বাঁশের ঝাড়ের ডগা জাগাইয়া লোকালয়ের অস্তিত্ব ঘোষণা করিতেছে।

এই বিস্তীর্ণ জলরাশির মধ্যে মৃত্তিকার গৌরব ঘোষণা করিতেছে শুধু কোম্পানীর উচু রেল-সড়কে। এই লে-সড়কই হইয়াছে বন্যা-বিতাড়িত পল্লীবাসীর একমাত্র আশ্রয়স্থল। যারা রেল-সড়কের মাটিতে জায়গা পায় নাই, তারা কলা গাছের ভেলা তৈরি করিয়া সপরিবারে সেই ভেলায় ভাসিতেছে।

দুপাশের দু-দশখানা গ্রামের সমস্ত লোক আসিয়া এই সড়কের উপর আশ্রয় লইয়াছে। রেল সড়কে তিল ধারণের স্থান নাই। মানুষ, পশু, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া গা ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া সড়কের উপর ভিড় করিয়া নৈসর্গিক বিপদের সাম্য-স্যাধনা-ক্ষমতা ঘোষণা করিতেছে।

যাঁহারা এতদিন দেশে উঁচু রেল স্থাপনের বিরোধিতা করিয়াছেন, যাঁরা বলিয়াছিলেন উঁচুরেল লাইন প্রতিঠাই দেশে অকল্যাণের কারণ তাঁরা আজ নিজেদের নির্বুদ্ধিতা বুঝিতে পারিয়া দাঁতে আঙ্গুল কাটিতেছেন। বন্যা ত এদেশে হবেই। তার উপর যদি উঁচু রেল-সড়কটাও না থাকে, তবে পোড়া দেশের লোক দাঁড়াইবে কোথায়?

২

বন্যা পীড়িত দেশবাসীর দুঃখে দেশহিতৈষী পরহিত-ব্রতী নেতৃবৃন্দের হৃদয় হুঙ্কার ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছে। কর্মীগণের চোখের দু'পাতা আর কিছুতেই

একত্র হইতে চাহিতেছে না। সংবাদপত্র-সম্পাদকের কলমের ডগা ফাটিয়া রক্ত বাহির হইতেছে।

দিকে-দিকে রিলিফ কমিটি স্থাপিত হইতেছে। রিলিফ কমিটির রশিদ বই ছাপিতে গিয়া কম্পোজিটগণের ঘুম নষ্ট কাজে, আর প্রতিবেশীর ঘুম নষ্ট প্রেসের আওয়াজে। রিলিফ কমিটির কর্মিগণ গলায় হারমনিয়াম ঝুলাইয়া দলে দলে মর্মান্তিক গান গাহিয়া চাঁদা তুলিতেছে। সে গানের মর্মান্তিকতায় গৃহলক্ষ্মীরা দোতলার বারান্দা হইতে হাতের বালা খুলিয়া কর্মীদের প্রসারিত ঝোলায় ছুরিয়া মারিতেছেন। কর্মীরা দাত্রীদের জয়ধ্বনি করিতেছে।

হামিদ চিরকালটা কেবল সংবাদপত্রে বন্যা দুর্ভিক্ষর বিবরণ পাঠ করিয়া কাটাইয়াছে। স্বচক্ষে সে কোনও দিন তা দেখে নাই। এবার স্বচক্ষে এই নৈসর্গিক বিপদের চেহারা দেখিয়া, আর খানিকটা বা কর্মীদের গানের মর্মাতিকতায় আকৃষ্ট হইয়া হৃদয় তাহার একবারে গলিয়া গেল।

সেদিন সে অফিসে বেতন পাইয়াছিল। পকেটে একমাসের বেতন ৪৩৷/৩ লইয়া গৃহে ফিরিতেছিল। মন তার কিছুতেই মানিল না। চাঁদা আদায়কারীদের দলপতির হাতে সে তিনখানা দশটাকার লোট গুজিয়া দিল। দলপতি বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। সে নাম বলিল। তিনি ধন্যবাদের 'জয়ধ্বনি করিবার ইশারা করিলেন। হামিদের নাম সম্বলিত জয়ধ্বনি তিনবার উচ্চারিত হইল। হামিদ নিজের নাম শুনিয়া লজ্জায় দ্রুতগতিতে বাসায় চলিয়া আসিল; পশ্চাতে নিজের নামে বিপুল জয়ধ্বনি হামিদের কানে বড়ই খারাপ লাগিতে লাগিল।

৩

পরদিন সকাল না হইতেই বাড়ির বাহিরে মোটরের আওয়াজ শুনিয়া হামিদ বাহিরে আসিল। দেখিল স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির সভাপতি, বারের শ্রেষ্ঠ উকিল কয়েকজন সাঙ্গপাঙ্গসহ হামিদের কুটিরদারে দাঁড়াইয়া। হামিদ সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। বসিবার ভাঙা চেয়ার টানাটানি আরম্ভ করিল। নেতাজি বাধা দিয়া বলিলেন : "ভদ্রতার কোনো প্রয়োজন নাই। দুস্থ উৎপীড়িত মহামানদের পক্ষ হইতে আপনি রিলিফ কমিটির ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। এত বড় একটা অন্তঃকরণ লইয়া আপনি আর লুকাইয়া থাকিতে পারিবেন না। আপনি রিলিফ কমিটির একজন সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। কমিটির মিটিং এ আপনি

উপস্থিত থাকিলে আমরা গৌরব বোধ করিব।"

ভদ্রলোক একদমে এতগুলি কথা বলিয়া হামিদের হাত ধরিয়া একটা বিরাট রকমের ঝাঁকি দিয়া মোটরে উঠিয়া পড়িলেন। মোটরে বসিয়া আবার দুই হাত তুলিয়া হামিদকে নমস্কার করিলেন। মোটর ভোঁ করিয়া চলিয়া গেল। হামিদ স্তম্ভিতের মতো দাঁড়াইয়া রহিল।

৪

বিকালে অফিসে বসিয়া হামিদ রিলিফ কমিটির সভার নিমন্ত্রণ পাইল। জনসেবা মহৎ কার্যে সে জীবনে কোনো দিন যায় নাই। দেশ ও জনসেবকদিগকে চিরকাল দূর হইতে সে সারা অন্তঃকরণ দিয়া ভক্তি করিয়া আসিয়াছে। আজ জীবনে প্রথম নিজেকে জন-সেবকদের পবিত্র দলের একজন হইতে দেখিয়া সে একেবারে ম্রিয়মাণ হইয়া গেল।

বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিত লোক এড়াইয়া অতি সাবধানে-সন্তর্পণে একরকম গা ঢাকা দিয়া হামিদ সভায় গেল। জিলার খ্যাতনামা নেতৃবৃন্দ ও দেশ-কর্মীগণের মধ্যে পড়িয়া সে লজ্জায় এতটুকু হইয়া গেল। সভায় যাহাদিগকে সে উপস্থিত দেখিল, প্রত্যহ ইহাদের নাম পাঠ করিয়া শ্রদ্ধায় কতবার ইহাদের উদ্দেশ্যে মাথা নেয়াইয়াছে। ইহাদের সঙ্গে এক সভায় বসিয়া দেশ সেবার আলোচনায় যোগদান করিবে হামিদ? নিজেকে সে কিছুতেই অতখানি বড় করিয়া ভাবিতে পারিল না।

হামিদকে সভাগৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই সভাপতি মহাশয় নানা-প্রকার অতিশয়োক্তি সহকারে সমবেত নেতৃবৃন্দের কাছে হামিদের পরিচয় দিলেন। হামিদ মাথা নিচু করিয়া বসিয়া রহিল।

সভায় অনেক আলোচনা হইল। বাক বিতণ্ডা হইল। মর্মস্পর্শী ভাষায় বন্যা-পীড়িতদের দুরবস্থা বর্ণিত হইল! সে সেব বক্তৃতায় ক্ষণে-ক্ষণে হামিদের রোমাঞ্চ হইল। কিন্তু সে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়াই আলোচনায় যোগদানের সাহস তাহার হইল না। সবকথা সে শুনিলও না, বুঝিলও না।

সভা-শেষে সকলে তাহাকে কংগ্রাচুলেট করিতে লাগিলেন। অতিকষ্টে সে কংগ্রাচুলেশনের কারণ জানিল যে কয়েকটি কেন্দ্রের পরিদর্শনের ভার তাহার উপর দেওয়া হইয়াছে।

৫

আর্তমানবতার সেবা-কার্যের জন্য ছুটি চাওয়া মাত্র অফিসের বড়-কর্তা হামিদের ছুটি মনজুর করিলেন। জীবনে এই প্রথম আর্তমানবতার সেবা-কার্যের জন্য পল্লী অঞ্চলের বন্যাপীড়িত ও দুর্ভিক্ষগ্রস্ত দেশবাসীর মধ্যে হামিদ ঝাঁপাইয়া পড়িল।

আর্ত জন-সেবায় অনভ্যস্ত সে। প্রথম কয়েকদিন সেবাকার্যের পদ্ধতির সঙ্গে সে নিজেকে কিছুতেই মানাইয়া চলিতে পারিল না। সেবাকার্যকে সে যতটা কষ্টকর, সুতরাং স্বর্গীয় মনে করিত, ততটা কোথায়ও দেখিল না বলিয়া প্রথম-প্রথম তার মনটা একটুখানি কেমন-কেমন করিতে লাগিল। মোটরলঞ্চে করিয়া চলে ভাসমান ভেলায় বাস-করা অভুক্ত কঙ্কালসার কৃষকগণকে দু-চার সের চাউল দিয়া আসিয়া রাত্রিবেলা তাম্বুর মধ্যে রাশি রাশি কম্বল-বিছানা খাটিয়ার উপর শয়ন করিয়া অঘোরে নিদ্রা যাইতে অথবা চা-সিগারেটসহ রাত্রি জাগিয়া তাস পিটিতে হামিদের প্রথম-প্রথম ভাল লাগিল না। কিন্তু সহকর্মীদের যুক্তিবলে কতকটা এবং নিজের অভিজ্ঞতায়ও কতকটা কয়েকদিনেই হামিদ বুঝিয়া উঠিল যে, সেবাকার্যের মতো অমন কঠোর কর্তব্য সাধন করিতে গেলে কর্মীদের দেহ জুৎসহ টেকসই রাখিবার জন্য ওসবের দরকার আছে। সে নিজে মানাইয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল; পারিলও কতকটা। সে দেখিল রিলিফ ফান্ডের টাকায় চৌদ্দআনা কর্মীদের ভরণ-পোষণে ব্যয় হইতেছে। বাকী দুই আনায় মাত্র সেবাকার্য চলিতেছে। তবু সেবা-কার্যে আনাড়ি সে ইহার প্রতিবাদে সাহসী হইল না। কারণ হয়ত বা এমন না হইলে সেবাকার্যই চলে না।

৬

হামিদ একদিন একটি কেন্দ্র পরিদর্শন করিতে গিয়াছে। দেখিল রিলিফ কমিটির তাম্বুর সামনে কাতার করিয়া শ'দুই অর্ধনগ্ন পুরুষ-স্ত্রী, ছেলে-বুড়ো, বালক-বালিকা টিকিট হাতে করিয়া বসিয়া আছে। অর্ধনগ্ন যুবতীরা ছেঁড়া নেকড়ায় মুখ ও বুক ঢাকিয়া জড়সড় হইয়া মাটির সঙ্গে মিশিয়া আছে, তবু একহাতে ইষৎ উঁচু করিয়া টিকিট ধরিয়া আছে। কারণ রিলিফ অফিসারের নিয়ম কড়া। সাহায্য প্রার্থীর সকলকেই উপস্থিত হইতে হইবে এবং টিকিট দেখাইয়া সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। মেয়েদের কোলে অশান্ত শিশুগুলি

ক্ষুধার তাড়নায় হাত-পা ছুড়াছুড়ি করিয়া মা দের ছেঁড়া নেকড়ায় বুক ঢাকিবার চেষ্টা বার বার ব্যর্থ করিয়া দিতেছে।

হামিদের গা কাঁটা দিয়া উঠিল। কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মীকে সে বলিল : ইহাদের বসাইয়া রাখিয়াছেন কেন? বিদায় করিয়া দিন না।

হামিদের স্বরে একটু বিরক্তির ভাব ফুটিয়া উঠিল।

কেন্দ্রকর্তা হামিদের বিরক্তিতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া বলিলেন : ইহাদের গণনা শেষ হয় নাই। কই হে নগেন, ইহাদের রেজিস্টারিটা বাহির কর ত ।

নগেন্দ্র নামক কর্মীটি একটি রুল-করা বাঁধাই বড় খাতা বাছিয়া বাহির করিয়া কাতারের সামনে গিয়া দাঁড়াইয়া উচ্চস্বরে নাম ডাকিতে লাগিল। আর কাতারের মধ্যে হাজির হাজির জবাব আসিতে লাগিল। কিছু কিছু মুশ্‌কিল হইতে লাগিল যুবতী স্ত্রীলোকদের লইয়া। তাহারা একেবারে কিছুতেই উচ্চস্বরে 'হাজির' ঘোষণা করিতেছিল না। কয়েক বারের চেষ্টায় এবং উচ্চস্বরে চিৎকার না করিয়ে কিছুতেই সাহায্য দেওয়া হইবে না এই প্রকারের শসানিতে 'হাজির' ঘোষণা করিতে রাজি হইতেছিল।

নাম ডাক শেষে উহাদের টিকিট চেক শুরু হইল। একজন কর্মী কাতারের এক মাথা হইতে লাল-নীল পেন্সিল দিয়া টিকিটে দাগ দিয়া যাইতে লাগিল। আরেকজন তার পিছে পিছে পেট বুঝিয়া এক ছটাক করিয়া চাউল বিতরণ করিয়া যাইতে লাগিল। অধিকাংশ সাহায্যার্থী আগ্রহভরে কাপড়ের আঁচল পাতিয়া নীরবে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিল। মাত্র দুই একটা বেয়াড়া লোক 'এতে কি হবে বাবু' বলিয়া গোলমাল করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু কর্মীদের ধমক ও চোখ রাঙানিতে তাহারা চুপ করিয়া বিড়বিড় করিয়া কি বকিতে থাকিল।

৭

প্রায় অর্ধেক লোককে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে, এমন সময় তাম্বুর সামনে একখানা নৌকা ভিড়িল।

দুইজন ভদ্রলোক নৌকা হইতে নামিলেন। কেন্দ্রকর্তা 'অসুন চক্রবর্তী' মশাই, আসুন চৌধুরী সাহেব" বলিয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া হামিদের নিকট আনিলেন এবং লোহার চেয়ারি বসিতে বলিলেন।

তারপর তিনি হামিদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, ইন্‌স্পেক্টর সাব, এরা দুইজন রঘুনাথপুরের শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও শমশের আলী চৌধুরী।

আহা! বন্যায় ভদ্রলোকদের যা অবস্থা হইয়াছে, তা আর বলিবার নয়। গোলার ধান চাল সব বন্যায় ভাসাইয়া নিয়াছে। কই হে শরৎ, বাবুদের চাল-ডালটা নৌকায় পৌছাইয়া দাও ত।

যতীন বাবু ও চৌধুরী সাহেব ব্যস্ত হইয়া বলিলেন : না, না, এরা দিয়া আলিবে কেন, আমাদের সংগেই লোক আছে। কইরে রামটহল, ইনাতুল্লাহকে সংগে নিয়ে এখানে আয় ত।

চৌকিদারী ইউনিফর্ম পরা লোক নৌকা হইতে ছালা ও ডালি লইয়া নামিয়া আসিল।

এতক্ষণ সমবেত কৃষকগণের মধ্যে যাহারা চাউল বিতরণ করিতে ছিল, তাহারা সকলেই বিতরণ-কার্য অর্ধ সমাপ্ত রাখিয়া ত্রস্তব্যস্ত চাউল-ডাউল মাপিয়া দুই বস্তা চাউল, এক ডালি ডাউল, এক ডালি লবণ মরিচাদি দিয়া দুইজনকে বিদায় করিল।

ভদ্রলোকদ্বয় উঠিয়া সকলকে ধন্যবাদ দিয়া হামিদকে নমস্কার ও আদাব দিয়া নৌকায় উঠিলেন।

কেন্দ্রকর্তা বন্যায় উহাদের ক্ষতির পরিমাণ সবিস্তার হামিদের নিকট বর্ণনা করিতেছিলেন।

সেদিকে হামিদের কান ছিল না। সে স্তম্ভিতের মতো বসিয়া সম্মুখস্থ অর্ধনগ্ন নরকঙ্কালগুলির দিকে চাহিয়া ছিল। তার অজ্ঞাতেই বোধ হয় তার চক্ষে অশ্রু ঠেলিয়া উঠিতেছিল।

অতিকষ্টে প্রকৃতিস্থ হইয়া হামিদ কঠোর ভাষায় কেন্দ্রকর্তাকে জিজ্ঞাসা করিল : এঁদের দুইজনকে কতজনের খোরাক দিলেন?

কেন্দ্রকর্তা উৎসাহভরে বলিলেন : এঁদের বিরাট ফ্যামিলি। এতক্ষণ তবে আর বলিলাম কি আপনার কাছে? জোত-জমি বাড়িতে দালান-কোঠা...

বাধা দিয়া হামিদ বলিল : কই ইঁহাদের ত টিকিট চেক করিলেন না?

কেন্দ্রকর্তা বিস্মিত হইয়া বালিলেন : বলেন কি? ইঁহাদের মতো লোক কি আর ফাঁকি দিয়া অতিরিক্ত চাউল লইতে পারে?

হামিদ রাগ সামলাইতে পারিল না। ঈষৎ ব্যঙ্গস্বরে বলিল : এই সমস্ত অভুক্ত কৃষক কি তবে ফাঁকি দিয়া অতিরিক্ত চাউল নেয়?

কেন্দ্রকর্তা অভিজ্ঞের মাতব্বরির স্বরে হাসিয়া বলিলেন : "আপনি রাখেন না এদের বদমায়েশির খবর। ইহারা—"

হঠাৎ গোলমালে তাহাদের কথোপকথনে বাধা পড়িল।

একটা বুড়ো লোক ও মধ্যবয়সী স্ত্রীলোককে কর্মীরা ধরিয়া টানাটানি করিয়া

তাহাদের দিকে আনিবার চেষ্টা করিতেছিল। স্ত্রীলোকটার কাপড় ধরিয়া তিন চারটা ন্যাংটা ছেলে-মেয়ে পিছন হইতে তাহাকে টানিতে ছিল এবং চিৎকার করিয়া কাঁদিতেছিল।

ব্যাপার কি দেখিবার জন্য হামিদ আসন হইতে উঠিতেই কেন্দ্রকর্তা তার জামার কোণ ধরিয়া বলিলেন : আপনি বসুন না, এখানেই ওদের লইয়া আসিবে।

হামিদ সবলে জামা ছাড়াইয়া লইয়া অগ্রসর হইল।

হামিদ গিয়া দেখিল বুড়াটাকে কর্মীরা দু-এক ঘা চর-চাপড় মারিতেছে এবং মেয়েলোকটার গলায় কাপড় লাগাইয়া টানাটানি করিতেছে।

হামিদ কাছে যাইতেই উহারা হাউমাউ করিয়া কি বলিতে চাহিল। কর্মীরা ধমক দিয়া বলিল : বেশি গোলমাল করবি তো পুলিশে দিব।

পুলিশের নাম শুনিয়া অপরাধীদ্বয় চুপ করিল। হামিদ সকলকে শান্ত হইতে বলিয়া গোলমালের কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

নগেন্দ্র নামক কর্মীটি তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল : মি. ইনস্পেক্টর, ইহারা অতিশয় বদমায়েশ লোক। ইহারা টিকিটের পেন্সিলের দাগ মুছিয়া ফেলিয়া দুইবার চাউল লাইয়াছে।

হামিদ কঠোর দৃষ্টিতে অপরাধীদ্বয়কে বলিল : একথা সত্যি?

উহারা মাথা হেঁট করিয়া রহিল। কোনো উত্তর দিল না। হামিদের বিষম রাগ হইল! কঠোরতর স্বরে চিৎকার করিয়া বলিল : কেন এমন অন্যায় কাজ করিলে উত্তর দাও।

জওয়াবে হতভাগ্য ও হতভাগিনী ভয়ে কাঁপিতে-কাঁপিতে যা বলিল, তার সারমর্ম এই যে, তাহাদের এত পোষ্য এবং তাদের এত ক্ষুধা যে, যে চাউল তাদের দেওয়া হয়, তাদের পেটের এক কোণাও ভরে না। তাই নিতান্ত নিরুপায় হইয়া তাহারা এই ফন্দি বাহির করিয়াছে।

কেন্দ্রকর্তা বিজয় গৌরবে হামিদের দিকে চাহিয়া হাসিলেন এবং অপরাধীদের দিকে চাহিয়া মেঘ গর্জনে আদেশ করিলেন : এই অপরাধের শাস্তিস্বরূপ আগামী দুইদিন তোমাদিগকে কোনো সাহায্য দেওয়া হইবে না।

নগেন্দ্র অপরাধীদ্বয়ের টিকিটে কালো দুইটি করিয়া দাগ দিয়া তাহাদের টিকিট ফিরাইয়া দিল।

দণ্ডিত হতভাগ্যদ্বয় মাথা নিচু করিয়া কম্পিত পদে চলিয়া গেল। অন্যান্য সাহায্যপ্রার্থীরাও তাহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া সমস্বরে অনেক টিট্‌কারী দিল। কেহ-কেহ অশ্রাব্য গালি-গালাজও দিল।

৮

কৃষকদের এই নীচতায় হামিদ ব্যথিত হইল বটে, কিন্তু সেবা কার্যে ছাষা-ভদ্রলোক পার্থক্য করা হইতেছে, ইহাতেও সে খানিকটা মনঃপীড়া বোধ করিল।

কেন্দ্রীয় সমিতিতে ইহার কোন প্রতিকার করা যায় কিনা দেখিবার জন্য হামিদ একদিনের জন্য সদরে ফিরিয়া আসিল।

সমিতির অফিসে গিয়া সে দেখিল, নেতারা সভা করিতেছেন। হামিদকে দেখিয়া সকলে আহলাদ প্রকাশ করিলেন বেং সভাশেষে সেবা-কার্যের বিবরণ শুনিবেন বলিলেন। হামিদ নীরবে সভাগৃহে বসিয়া সভার কার্য দেখিতে লাগিল এবং সভাশেষে নিজের বক্তব্য নিবেদন করিল।

সভায় অন্যান্য প্রস্তাবের সংগে এই একটি প্রস্তাবও সর্বসম্মতিক্রমে পাস হইল যে মিডল ক্লাস ভদ্রলোকদের সাহায্য করিবার জন্য সতন্ত্র ফান্ড খোলা হউক এবং মিডল ক্লাস ভদ্রলোকদের নিকট প্রাপ্ত সমস্ত টাকা দুঃস্থ মিডল ক্লাস ভদ্রলোকদের সেবা-কার্যের জন্য ইয়ারমার্ক করিয়া রাখা হউক।

ইহার পর নিজের বক্তব্য সভার কাছে উপস্থিত করিবার প্রবৃত্তি আর হামিদের রইল না। হামিদ সেই দিনই রিলিফ কেন্দ্রে চলিয়া গেল।

পরদিন সকালে সমস্ত সাহায্যপ্রার্থী যথারীতি কাতার করিয়া জমা হইল। কাতারের মধ্যে গতকল্যকার দণ্ডিত অপরাধীদ্বয়কেও দেখা গেল।

কেন্দ্রকর্তার আদেশে উহাদিগকে গলাধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দেওয়া হইল; হামিদের সুপারিশের উত্তরে কেন্দ্রকর্তা বলিলেন যে, তিনি কোনক্রমেই ডিসিপ্লিন ভাংগিতে প্রস্তুত নহেন।

দণ্ডিত অপরাধীদ্বয় ক্ষুধার্ত পুত্র-কন্যাসহ চোখের পানি মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল।

অন্যান্য সাহায্য-প্রার্থী আগের দিনের মতো আর টিটকারি দিলো না, বরঞ্চ সকলেই গোপনে গোপনে এক-আধটু সহানুভূতি দেখাইল এবং ভারাক্রান্ত মনে বিদায় হইল।

তৃতীয় দিনও অপরাধীদ্বয় আসিয়া কাতারের মধ্যে লুকাইয়া রহিল। কিন্তু তাদের নির্বোধ ছেলে-মেয়ের জন্য অধিক্ষখণ লুকাইয়া থাকিতে পারিল না, ধরা পড়িল। কর্মীরা তাহাদিগকে কিল-ঘুষি দিয়া বাহির করিয়া দিল। অপর সাহায্য প্রার্থীদের অনেকে তাহাদের হইয়া অনুনয় বিনয় করিল, কেহ সুপারিশ করিল। কথাবার্তায় জানা গেল যে, আগেকারদিন উহাদিগকে সাহায্য না

দেওয়ায় অন্যান্য সকলের অসুবিধা হইয়াছে; কেননা অন্যান্য সকলে তাহাদের ভাগ হইতে কিছু কিছু দিয়া উহাদিগকে খাওয়াইয়াছে। অভুক্ত নাবালক শিশু কন্যাগুলিকে অনাহারে রাখিয়া তাহারাই বা পেটে ভাত দেয় কি করিয়া।

ভিখারীদের এই দাতাগিরির জন্য কেন্দ্রকর্তা রাগে অগ্নিশর্মা হইলেন। উপস্থিত সমস্ত সাহায্য-প্রার্থীকে মুখ ভেংচায়া গালি দিয়া তিনি বলিলেন : বেটারা ভিক্ষার চাউল দিয়া আবার দানছত্র খুলিয়াছিস? চোরকে যারা সাহায্য করিয়াছে, সে সব বেটা চোর। কোনো বেটাকেই আজ আর সাহায্য দিব না।

সেদিনকার বিতরণ বন্ধ হইয়া গেল। সমবেত সাহায্য-প্রার্থীরা অনেক অনুনয় বিনয় করিল। কিন্তু কোন ফল হইল না। কেন্দ্রকর্তা হামিদের অনুরোধেও তাঁহার সিদ্ধান্ত বদলাইতে রাজি হইলেন না। অবশেষে জনতার গলায় প্রতিবাদের ভাষা ফুটিয়া উঠিল। ভদ্রলোকদের খাতির করা হয়, গরীবের সামান্য অপরাধও মাফ করা হয় না, ইত্যাদির কথা জনতার মধ্য ইতে শোনা যাইতে লাগিল। কেন্দ্রকর্তার ধৈর্যের বাঁধ ভাংগিয়া গেল। জোরে চিৎকার করিয়া তিনি চাউলের বস্তা তাম্বুতে তুলিবার আদেশ দিলেন। হামিদকে কিছু বলিবার সুযোগ না দিয়া তিনি তাকে একরূপ জোর করিয়া তাম্বুর মধ্যে লইয়া গেলেন। কি কর্তব্য কিছু স্থির করিতে না পারিয়া হামিদও অগত্যা কেন্দ্রকর্তার সংগে তাম্বুতে প্রবেশ করিয়া খাটিয়ায় শুইয়া পড়িল এবং ভাবিতে লাগিল।

হামিদ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। কেন্দ্রকর্তার হাঁকাহাঁকিতে ঘুম ভাংগিয়া গেল। আবার কিসের গণ্ডগোল? জিজ্ঞাস করিয়া জানিতে পারিল, সাহায্য না পাওয়ায় মাঝিরা আজ আর মাছ দিয়া যায় নাই। কাজেই কর্মীদের জন্য আজ আলু ভর্তা আর ডাল ছাড়া কিছু রান্না করা হয় নাই। ইহাতেই কেন্দ্রকর্তার এই রাগারাগি ও হাঁকাহাঁকি।

খাওয়ার আয়োজনও ভাল ছিল না। হামিদেরও ক্ষুধা ছিল না। কাজেই বিশেষ কিছু না খাইয়াই হামিদ তাম্বুর বাহির হইয়া পল্লীতে প্রবেশ করিল। দেখিল অভুক্ত কৃষকেরা এক-এক জায়গায় জটলা করিয়া কি পরামর্শ করিতেছে। হামিদকে দেখিয়াই সকলে ছত্রভংগ হইয়া পড়িল। হামিদের অনেক ডাকাডাকিতেও কেহ সাড়া দিল না।

মনটা তার অত্যন্ত খারাপ ছিল। এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া সন্ধ্যায় তাম্বুতে ফিরিয়া দেখিল, কর্মীরা আন্ডা রুটি ও চা লইয়া মাতিয়া গিয়াছে। হামিদ নিঃশব্দে নিজের বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে ঘুমাইয়া পড়িল।

৯

হঠাৎ কোলাহলে হামিদের ঘুম ভাংগিয়া গেল। 'চোর' 'ডাকাত' ইত্যাদি চেঁচামেচি ও কান্নাকাট তার কানে গেল। সে ধড়মড় করিয়া উঠিল। প্রায় সকলেরই কাছে রিলিফ কমিটির টাকায় কেনা এক একটা এভার-রেডি ব্যাটারিসহ গ্রীনউইচ টর্চলাইট ছিল। হামিদকেও একটা দেওয়া হইয়াছিল। টর্চলাইটের আলো ফেলিয়া তাম্বুও তাহার চতুর্দিক আলোকিত করা হইল। দেখা গেল ১০/১৫ জন অর্ধনগ্ন লোক এক-এক বস্তা চাউল মাথায় লইয়া যথাশক্তি দ্রুতগতিতে এদিক ওদিক পালাইতেছে।

কর্মীরা ছিল কংগ্রেসের ড্রিল-করা ভলান্টিয়ার। তাদের অনেকে আবার ডনগির কুস্তিগির ও যুযুৎসুবিদ। পক্ষান্তরে পাড়াগাঁয়ের এই চোরেরা ছিল অনেক দিনের ক্ষুধিত সুতরাং দুর্বল। তারপর চাউলের বস্তা তাদের মাথায় ছিল। কাজেই অল্পক্ষণেই তাদের অনেকেই ধরা পড়িল।

রাত্রেই থানায় খবর দেওয়া হইল। দারোগা সাহেব একপাল পুলিশসহ অকুস্থলে হাজির হইলেন। ধৃত আসামীদিগকে আচ্ছা করিয়া সাপমারা মার দিলেন। মারের চোটে পলায়িত চোরদেরও নাম বাহির হইল।

সূর্যোদয়ের পূর্বেই মধুপুর গ্রামের শতাধিক ছেলেবুড়াকে হাত কড়া পরা অবস্থায় রিলিপ কমিটির তাম্বুর সম্মুখে জমা করা হইল। দারোগা সাহেব সাড়ম্বরে হামিদদের সকলের জবানবন্দি গ্রহণ করিলেন। জবানবন্দি শেষ করিয়া এক পাল অভুক্ত অর্ধনগ্ন নরকংকালকে ভেড়ার পালের মতো খেদাইয়া থানার দিকে লইয়া গেলেন।

বিচারে শতাধিক লোকের কারাদণ্ডের আদেশ হইল। রিলিফ কার্যের ন্যায় পবিত্র ধর্মকার্যে বাধাদানকারী এই সমস্ত নরপিশাচের বিচার দেখিবার জন্য অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি, রিলিফ কমিটির সমস্ত মাতব্বর সদস্য ও শতাধিক ভলান্টিয়ার আদালত প্রাঙ্গণে উপস্থিত ছিলেন। হাকিমের রায় হওয়া মাত্র তাঁহারা সমস্বরে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন : জয় রিলিফ কমিটি কি জয়।

সমবেত দর্শকমণ্ডলীর প্রায় সকলেই ভদ্রলোক। কাজেই এই নরপিশাচের নীচতায় সকলেই ছি ছি করিতে লাগিল। দণ্ডিত নরপিশাচেরা পুলিশের ব্যাটনের মুখে অধোবদনে জেলে চলিয়া গেল।

সেইদিনই হামিদ রিলিফ কমিটির সদস্যপদে ইস্তফা দিয়া অফিসের কাজে যোগদান করিল।

নয়নচারা

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

ঘনায়মান কালো রাতে জনশূন্য প্রশস্ত রাস্তাটাকে ময়ূরাক্ষী নদী বলে কল্পনা করতে বেশ লাগে। কিন্তু মনের চরে যখন ঘুমের বন্যা আসে, তখন মনে হয় ওটা সত্যিই ময়ূরাক্ষী; রাতের নিস্তব্ধতায় তার কালো স্রোত কল-কল করে, দূরে আঁধারে ঢাকা তীররেখা নজরে পড়ে একটু-একটু, মধ্যজলে ভাসন্ত জেলেডিঙিগুলোর বিন্দু-বিন্দু লালচে আলো ঘন আঁধারেও সর্বংসহা আশার মতো মৃদু-মৃদু জ্বলে।

তবে, ঘুমের স্রোত সরে গেলে মনের চর শুষ্কতায় হাসে : ময়ূরাক্ষী! কোথায় ময়ূরাক্ষী! এখানে তো কেমন ঝাপসা গরম হাওয়া। যে-হাওয়া নদীর বুক বেয়ে ভেসে আসে সে-হাওয়া কি কখনো অত গরম হতে পারে?

ফুটপাথে ওরা সব এলিয়ে পড়ে রয়েছে। ছড়ানো খড় যেন। কিন্তু দুপুরের দিকে লঙ্গরখানায় দুটি খেতে পেয়েছিল বলে তবু তাদের ঘুম এসেছে—মৃত্যুর মতো নিঃসাড় নিশ্চল ঘুম। তবে আমুর চোখে ঘুম নেই, শুধু কখনো-কখনো কুয়াশা নাবে তন্দ্রার, এবং যদি-বা ঘুম এসে থাকে, সে-ঘুম মনে নয়—দেহে; মন তার জেগে রয়েছে চেনা নদীর ধারে, কখনো কল্পনায় কখনো নিশ্চিত বিশ্বাসে, এবং শুনছে তার অবিশ্রান্ত মৃদু কলস্বন, আর দূরে জেলেডিঙিগুলোর পানে চেয়ে ভাবছে। ভাবছে যে এরই মধ্যে হয়তো-বা ডিঙির খোদল ভরে উঠেছে বড় বড় চকচকে মাছে—যে চকচকে মাছ আগামীকাল চকচকে পয়সা হয়ে ফিরে ভারী করে তুলবে জেলেদের ট্যাঁক। আর হয়তো-বা —কী হয়তো-বা?

কিন্তু ভুতনিটা বড় কাশে। খক্কক খক্কক খ খ খ। একবার শুরু হলে আর থামতে চায় না, কেবল কাশে আর কাশে, শুনে মনে হয় দম বন্ধ না হলে ও-কাশি আর থামছে না; তবু থামে আশ্চর্যভাবে, তারপর সে হাঁপায়। কাশে, কখনো-বা ঘুমের মধ্যে কেঁদে ওঠে, অথচ ঘুম লেগে থাকে জোঁকের মতো।

ভুতনির ভাই ভুতো কাশে না বটে তবে তার গলায় কেমন ঘড়-ঘড় আওয়াজ হয় একটানা, যেন ঘুমের গাড়িতে চেপে স্বপ্ন-চাকায় শব্দ তুলে সে কোথায় চলেছে যে চলেছেই। তাছাড়া সব শান্ত, নীরবতা পাখা গুটিয়ে নিশ্চল হয়ে রয়েছে, আর জমাট-বাঁধা ঘনায়মান কালো রাত্রি পর্বতের মতো দীর্ঘ, বৃহৎ ও দুর্লঙ্ঘ্য।

ভুতনিটা এবার জোর আওয়াজে কেশে উঠল বলে আমুর মনের কুয়াশা কাটল। সে ভরা-চোখে তাকাল ওপরের পানে—তারার পানে এবং অকস্মাৎ অবাক হয়ে ভাবল, ওই তারাগুলিই কি সে বাড়ি থেকে চেয়ে-চেয়ে দেখত? কিন্তু সে-তারাগুলোর নিচে ছিল ঢালা মাঠ, ভাঙা মাটি, ঘাস, শস্য আর ময়ূরাক্ষী। আর এ-তারাগুলোর নিচে খাদ্য নেই, দয়ামায়া নেই, রয়েছে শুধু হিংসাবিদ্বেষ নিষ্ঠুরতা, অসহ্য বৈরিতা।

কিন্তু তবু ওরা তারা। তাদের ভালো লাগে। আর তাদের পানে চাইলে কী যেন হঠাৎ সমস্ত কিছু ছাপিয়ে বিপুল বাহু মেলে আসে, আসে—। কিন্তু যা এসেছিল, মুহূর্তে তা সব শূন্য রিক্ত করে দিয়ে গেল। কিছু নেই...। শুধু ঘুম নেই। কিন্তু তাই যেন কোথায় যেতে ইচ্ছে করছে। নদীতে জোয়ার না ভাটা? মনে হচ্ছে ভাটা, এবং এ-ভাটাতে ভেসে যাবার প্রবল ইচ্ছে হচ্ছে তার। সে ভেসে যাবে, যাবে, প্রশস্ত নদী তাকে নিয়ে যাবে ভাসিয়ে, দূরে বহুদূরে—কোথায় গো? যেখানে শান্তি—সেইখানে? কিন্তু সেই শান্তি কি বিস্তৃত বালুচরের শান্তি?

তবে এখানে মানুষের পায়ের আওয়াজ হয়। আর এখানে শহর। মন্থরগতিতে চলা একজোড়া পায়ের আওয়াজ ঘুরে আসছে গলি দিয়ে, এবং নদীর মতো প্রশস্ত এ-রাস্তায় সে যখন এল তখন আমু বিস্মিত হয়ে দেখল যে লোকটির মধ্যে শয়তানের চোখ জ্বলছে, আর সে-চোখ হীনতায় ক্ষুদ্রতম ও ক্রোধে রক্তবর্ণ। হয়তো-বা সেটা শয়তানের চোখ নয়, হয়তো শুধুমাত্র একটা বিড়ি। তাহলে অদৃশ্যপ্রায় কালো শয়তানের হাতে বিড়ি, যেটা দুলছে কেবল তার হাতের দোলার সাথে। শয়তানকে দেখে বিস্ময় লাগে, বিস্ময়ে চোখ ঠিকরে যায়, ঘন অন্ধকারে তাতে আগুন ওঠে জ্বলে। তবে শুধু এই বিস্ময়ই; ভয় করে না একটুও; বরঞ্চ সে যেন শয়তানের সাথে মুখোমুখি দেখা করবার জন্যে অপেক্ষমাণ। তাছাড়া, রাস্তার অপর পাশের বাড়িটার একটি বন্ধ-জানালা থেকে যে উজ্জ্বল ও সরু একটা আলোরেখা দীর্ঘ হয়ে রয়েছে, সে-আলোরেখায় যখন গতিরুদ্ধ স্তব্ধতা, তখন শয়তানের হাতে আগুন জ্বলতে দেখলে আরো ক্রোধ হয় মানুষের। আগুনটা দুলছে না তো যেন হাসছে; আমুরা যখন ক্ষুধার যন্ত্রণায় ককায়—তখন পথচলতি লোকেরা যেমন আলাদা অপরিচিত দুনিয়ার কোনো অজানা কথা নিয়ে হাসে, এও যেন তেমনি হাসছে। কিন্তু কেন হাসবে?

দীর্ঘ-উজ্জ্বল সে-রেখাকে তার ভয় নেই? জানে না সে যে ওটা খোদার দৃষ্টি—অকম্পিত দ্বিধাশূন্য ঋজু দৃষ্টি? তবু আলো-কণা হাসে, হাসে কেবল, পেছনে কালো শয়তান কালো রঙে হাসে। তা হাসুক, আলাদা দুনিয়ায় হাসুক, কারো কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু এ দুনিয়ায়—যে-দুনিয়ায় ঘর ছেড়ে লোকেরা কালো নদীর ধারে-ধারে পড়ে রয়েছে ভাটির টানে ভেসে যাবে বলে, সে-দুনিয়ায় তাকে সে হাসতে দেবে না—দেবে না।

তবু কালো শয়তান রহস্যময়ভাবে এগিয়ে আসছে, শূন্য ভাসতে-ভাসতে যেন এগিয়ে আসছে ক্রমশ, এসে, কী আশ্চর্য, আলোরেখাটাও পেরিয়ে গেল নির্ভয়ে, এবং গতিরুদ্ধ দীর্ঘ সে-রেখা বাধা দিল না তাকে। মৃতগতির পানে চেয়ে নদীর বুকে তারপর নাবল কুয়াশা; আমুর চোখে পরাজয় ঘুম হয়ে নাবল। পরাজয় মেনে নেয়াতেও যেন শান্তি।

রোদদগ্ধ দিন খরখর করে। আশ্চর্য কিন্তু একটা কথা : শহরের কুকুরের চোখে বৈরিতা নেই। (এখানে মানুষের চোখে, এবং দেশে কুকুরের চোখে বৈরিতা)। তবু ভালো।

ময়রার দোকানে মাছি বোঁ-বোঁ করে। ময়রার চোখে কিন্তু নেই ননী-কোমলতা, সে-চোখময় পাশবিক হিংস্রতা। এত হিংস্রতা যে মনে হয় চারধারে ঘন অন্ধকারের মধ্যে দুটো ভয়ঙ্কর চোখ ধক্‌ধক্ করে জ্বলছে। ওধারে একটা দোকানে যে ক-কাঁড়ি কলা ঝুলছে, সেদিক পানে চেয়ে তবু চোখ জুড়ায়। ওগুলো করা নয়তো, যেন হলুদ-রঙা স্বপ্ন ঝুলছে। ঝুলছে দেখে ভয় করে—নিচে কাদায় ছিঁড়ে পড়বে কি হঠাৎ? তবু, শঙ্কা ছাপিয়ে আমুর মন ঊর্ধ্বপানে মুখ করে কেঁদে ওঠে; কোথায় গো, কোথায় গো নয়নচারা গাঁ?

লালপেড়ে শাড়ি ঝলকাচ্ছে; রক্ত ছুটছে। যেমন করিম মিঞার মুখ দিয়ে সেদিন ফিনকি দিয়ে ছুটেছিল রক্ত। তবে মেয়েটার গলার নিচেটা শাদা, এত শাদা যে মনটা হঠাৎ স্নেহের ছায়ায় ছুটে গিয়ে উপুড় হয়ে পড়বার জন্যে খাঁখাঁ করে ওঠে। মেয়েটি হঠাৎ দুটি পয়সা দিয়ে চলে গেল রক্ত ঝলকিয়ে। কিন্তু একটা কথা: ও কি ভেবেছে যে তার মাথায় সাজানো চুল তারই? আমু কি জানে না—আসলে ও চুল কার। ও-চুল নয়নচারা গাঁয়ের মেয়ে ঝিরার মাথার ঘন কালো চুল।

কিন্তু পথে কত কালো গো। অদ্ভুত চাঞ্চল্যময় অসংখ্য অগুনতি মাথা; কোন্-সে অজ্ঞাত হাওয়ায় দোলায়িত এ-কালো রঙের সাগর। এমন সে দেখেছে শুধু ধানক্ষেতে, হাওয়ায় দোলানো ধানের ক্ষেতের সাথে এর তুলনা করা চলে। তবু তাতে আর এতে কত তফাত। মাথা কালো, জমি কালো, মন

কালো। আর দেহের সাথে জমির কোনো যোগাযোগ নেই, যে-হাওয়ায় তারা চঞ্চল কম্প্রমান, সে-হাওয়াও দিগন্ত থেকে উঠে-আসা সবুজ শস্য কাঁপানো সূক্ষ্ম অন্তরঙ্গ হাওয়া নয়; এ-হাওয়াকে সে চেনে না।

অসহ্য রোদ। গাছ নেই। ছায়া নেই নিচে, কোমল ঘাস নেই। এটা কী রকম কথা : ক্লান্তিতে দেহ ভেঙে আসছে অথচ ছায়া নেই ঘাস নেই। আরো বিরক্তিকর—এ-কথা যে কাউকে বলবে, এমন কোনো লোক নেই। এখানে ইটের দেশে তো কেউ নেইই, তার দেশের যারা-বা আছে তারাও মন হারিয়েছে, শুধু গোঙানো পেট তাদের হা করে রয়েছে। অন্ধ চোখে চেয়ে।

তবু যাক, ভুতনি আসছে দেখা গেল। কী রে ভুতনি? ভুতনি উত্তর দিলে না, তার চোখ শুধু ড্যাবড্যাব করছে, আর গরম হাওয়ায় জট-পড়া চুল উড়বার চেষ্টা করছে। কিন্তু কী রে ভুতনি? ভুতনি এবার নাক ওপরের দিকে তুলে কম্পমান জিহ্বা দেখিয়ে হঠাৎ কেঁদে ফেললে ভ্যাঁ করে। কেউ দিল না বুঝি, পেট বুঝি ছিঁড়ে যাচ্ছে? কিন্তু একটা মজা হয়েছে কী জানিস, কোত্থেকে একটা মেয়ে রক্ত ছিটাতে-ছিটাতে এসে আমাকে দুটো পয়সা দিয়ে চলে গেল, তার মাথায় আমাদের সেই ঝিরার মাথার চুল—তেমনি ঘন, তেমনি কালো...। আর তার গলার নিচেটা—। ভুতনির গলার তলে ময়লা শুকনো কাদার মতো লেগে রয়েছে। থাক সে কথা। কিন্তু তুই কাঁদছিস ভুতনি? ভুতনি, ওরে ভুতনি?

কী একটা বলে ফেলে ভুতনি চোখ মুখ লাল করে কাশতে শুরু করল। তার ভাই ভুতো মারা গেছে। কোনো নতুন কথা নয়, পুরোনো কথা শুধু আবার বলা হল। সে মরেছে, ও মরেছে; কে মরেছে বা কে মরছে সেটা কোনো প্রশ্ন নয়, আর মরছে মরেছে কথা দু-রঙা দানায় গাঁথা মালা, অথবা রাস্তায় দু-ধারের সারি-সারি বাড়ি—যে-বাড়িগুলো অদ্ভুতভাবে অচেনা অপরিচিত, মনে হয় নেই অথচ কেমন আলগোছে অবশ্য রয়েছে।

ভুতনির কান্না কাশির মধ্যে হারিয়ে গেল। কাশি থামলে ভুতনি হঠাৎ বললে, পয়সা? তার পয়সার কথাই যেন শুধোচ্ছে। হ্যাঁ, দুটো পয়সা আমুর কাছে আছে বটে কিন্তু আমু তা দেবে কেন? ভুতনির চোখ কান্নায় প্যাক-প্যাক করছে, আর কিছু-কিছু জ্বলছে। কিন্তু আমু কেন দেবে? ভুতনি আরো কাঁদল, আগের চেয়ে এবার আরো তীব্রভাবে। তাই দেখে আমুর চোখ জ্বলে উঠল। চোখ যখন জ্বলে উঠল তখন দেহ জ্বলতে আর কতক্ষণ; একটা বিদ্রোহ—একটা ক্ষুরধার অভিমান ধাঁ-ধাঁ করে জ্বলে উঠল সারা দেহময়। তাতে তবু কেমন যেন প্রতিহিংসার উজ্জ্বলন্ত উপশম।

সন্ধে হয়ে উঠছে। বহু অচেনা পথে ঘুরে-ঘুরে আমু জানলে যে ও-পথগুলো

পরের জন্যে, তার জন্যে নয়। রূপকথার দানবের মতো শহরের মানুষরা সায়ন্তন ঘরাভিমুখ চাঞ্চল্যে থরথর করে কাঁপছে। কোন্-সে গুহায় ফিরে যাবার জন্যে তাদের এ-উদগ্র ব্যস্ততা? সে-গুহা কি ক্ষুধার? এবং সে-গুহায় কি স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে মাংসের টিলা, ভাতের পাহাড়, মাছের স্তূপ? কত বৃহৎ সে-গুহা?

অচেনা আকাশের তলে অচেনা সন্ধ্যায় আমুর অন্তরে একটা অচেনা মন ধীরে-ধীরে কথা কয়ে উঠছে। ক্ষীণ তার আওয়াজ, তবু মনে হয় গুহার পানে প্রবাহিত এ-বিপুল জলস্রোতকে ছাপিয়ে উঠছে তা। কী কইছে সে? অস্পষ্ট তার কথা অথচ সে-অস্পষ্টতা অতি উগ্র; মানুষের ভাষা নয়, জন্তুর হিংস্র আর্তনাদ। কী? এই সন্ধ্যা নাহয় অচেনা সন্ধ্যা হল; রূপকথার সন্ধ্যাও তো সন্ধ্যা, কিন্তু তবু সন্ধ্যা, আর এ-সন্ধ্যায় তুমি আমাকে নির্মমভাবে কণ্টকাকীর্ণ প্রান্তরে দাঁড় করিয়ে রেখেছ? কে তুমি, তুমি কে? জানো, সারা আকাশ আমি বিষাক্ত রুক্ষ জিহ্বা দিয়ে চাটব, চেটে-চেটে তেমনি নির্মমভাবে রক্ত ঝরাব সে-আকাশ দিয়ে—কে তুমি, তুমি কে?

আমুর সমস্ত মন স্তব্ধ, এবং নুয়ে রয়েছে অনুতপ্ত অপরাধীর মতো। সে ক্ষমা চায়; শক্তিশালীর কাছে সে ক্ষমা চায়। যেহেতু শক্তিশালীর অন্যায়ও ন্যায়, সে-ন্যায়ের প্রতি অন্যায় করা গুরুতর পাপ। সে পাপ করেছে, এবং তাই সে ক্ষমা চায়; দুটি ভাত দিয়ে শক্তিশালী তাকে ক্ষমা করুক। চারধারে তো রাত্রির ঘন অন্ধকার, শক্তিশালীর ক্ষমা করার কথা জানবে না কেউ, শুনবে না কেউ।

ওধারে কুকুরে-কুকুরে কামড়াকামড়ি লেগেছে। মনের এ-পবিত্র সান্ত্বনায় সে-কোলাহলের তীক্ষ্ণ আওয়াজ অসহনীয় মনে হল বলে হঠাৎ আমু দূর-দূর বলে চেঁচিয়ে উঠল, তারপর জানল যে ওরা মানুষ, কুকুর নয়! অথবা ভেতরে কুকুর, বাইরে কুকুর নয়।

কিন্তু আমু মানুষ, ভেতরে-বাইরে মানুষ। সে মাপ চায়। কিছুক্ষণ পর সে হঠাৎ উঠে পড়ল, তারপর অদ্ভুত দৃষ্টিতে কিসের সন্ধানে যেন তাকাল রাস্তার ক্ষীণ আলো এবং দু-পাশের স্বল্পালোকিত জানালাগুলোর পানে। একতলা দোতলা তেতলা—আরো উঁচুতে স্বল্পালোকিত জানালা ধরাছোঁয়ার বাইরে! তুমি কি ওখানে থাকো?

তারপর কখন মাথায় ধোঁয়া উড়তে লাগল। এবং কথাগুলো মাথায় ধোঁয়া হয়ে উড়ছে; উদরের অসহ্য তাপে জমা কথাগুলো ধোঁয়া হয়ে বাষ্প হয়ে উড়ে যাচ্ছে। আর গলাটা যেন সুড়ঙ্গ, আমু শুনতে পারছে বেশ যে, কেমন একটি অতি ক্ষীণ আওয়াজ সে-গভীর ও ফাঁকা সুড়ঙ্গ বেয়ে পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে উঠে আসছে ওপরের

পানে এবং অবশেষে বাইরে যখন মুক্তি পেল তখন তার আঘাতে অন্ধকারে ঢেউ জাগল, ঢেউগুলো দু-ধারের খোলা-চোখে—ঘুমন্ত বাড়িগুলোর গায়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এল তার কানে। মা-গো, চাট্টি খেতে দাও—

এই পথ, ওই পথ; এখানে পথের শেষ নেই। এখানে ঘরে পৌছানো যায় না। ঘর দেখা গেলেও কিছুতেই পৌছানো যাবে না সেখানে। ময়রার দোকানে আলো জ্বলে, কারা খেতে আসে,কারা খায়, আর পয়সা ঝনঝন করে; কিন্তু এধারে কাচ। কাচের এপাশে মাছি, আর পথ আর আমু। তবু দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ভেতর থেকে কে একটি লোক বাজের মতো খাঁইখাঁই করে তেড়ে এল। আরে, লোকটি অন্ধ নাকি? মনে-মনে আমু হঠাৎ হাসল একচোট। অন্ধ না হলে অমন করবে কেন? দেখতে পেত না যে সে মানুষ?

পথে নেবে আমু ভাবলে, একবার সে শুনেছিল শহরের লোকেরা অন্ধ হলে নাকি শোভার জন্যে নকল চোখ পরে। দোকানের লোকটি অন্ধই, আর তার চোখে সে-নকল চোখ। কিছু একটা আওয়াজ শুনে হয়তো ভেবেছে বাইরে কুকুর, তাই তেড়ে উঠেছিল অমন করে। কিন্তু সে-কথা যাক, আশ্চর্য হতে হয় কাণ্ড দেখে, নকল চোখে আর আসল চোখে তফাত নেই কিছু।

তারপর মাথায় আবার ধোঁয়া উড়তে লাগল। ময়ূরাক্ষীর তীরে কুয়াশা নেবেছে। স্তব্ধ দুপুর; শান্ত নদী। দূরে একটি নৌকায় খরতাল ঝনঝন করছে, আর এধারে শ্মশানঘাটে মৃতদেহ পুড়ছে। ভয় নেই। মৃত্যু কোথায়? মৃত্যুকে সে পেরিয়ে এসেছে, আর অলিগলি দিয়ে ঘুরে মৃত্যুহীনতার উন্মুক্ত সদর রাস্তায় সে এসে পড়েছে।

কড়া একটা গন্ধ নাকে লাগছে। কী কোলাহল। লোকেরা আসছে, যাচ্ছে। হোটেল। দাঁড়াবে কি এখানে? দাঁড়ালেও দাঁড়াতে পারে, তবে নকল-চোখপরা কোনো অন্ধ তো নেই এখানে, আওয়াজ পেয়ে তেড়ে আসবে না তো খাঁইখাঁই করে? কিন্তু গন্ধটা চমৎকার। তারপর বোশেখ মাসে শূন্য আকাশ হঠাৎ যেমন মেঘে ছেয়ে যায়, তেমনি দেখতে-না-দেখতে একটা ভীষণ কালো ক্রোধে তার ভেতরটা করাল হয়ে উঠল, আর কাঁপতে থাকল সে থরথর করে; সিঁড়ির ধারে একটা প্রতিবাদী ভঙ্গিতে সে রইল দাঁড়িয়ে। অবশেষে ভেতর থেকে কে চেঁচিয়ে উঠল, আরেকজন দ্রুত পায়ে এল এগিয়ে, এসে হীন ভাষায় কর্কশ গলায় তাকে গালাগাল দিয়ে উঠল। এইজন্যেই আমু প্রস্তুত হয়ে ছিল। হঠাৎ সে ক্ষিপ্তের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর, এবং তারপর চকিতে ঘটিত বহু ঝড়ঝাপটার পর দেহে অসহ্য বেদনা নিয়ে আবার যখন সে পথ ধরল, তখন হঠাৎ কেমন হয়ে একবার ভাবলে : যে-লোকটা তাড়া করে এসেছিল সেও যদি

ময়রার দোকানের লোকটার মতো অন্ধ হয়ে থাকে? হয়তো সেও অন্ধ, তারও চোখ নকল। শহরে এত এত লোক কি অন্ধ? বিচিত্র জায়গা এই শহর।

চাঞ্চল্যকর ঘটনাটির পর উত্তেজিত মাথা ঠাণ্ডা হতে সময় নিল এবং সে-উত্তেজনার মধ্যে কোন্ কোন্ রাস্তা হতে কোন্ কোন্ রাস্তায় ঘুরে-ঘুরে হঠাৎ একসময়ে সে থমকে দাঁড়াল, দাঁড়িয়ে ভাবল : যে-পথের শেষ নেই, সে-পথে চলে লাভ নেই, বরঞ্চ ওই-যে ওখানে কে ককাচ্ছে সেখানে গিয়ে দেখা যাক কী হয়েছে তার। ফুটপাথের ধারে গ্যাসপোস্ট, তার তলে আবছা অন্ধকারে কে একটা লোক শুয়ে রয়েছে, আর পেটে হাত চেপে দুরন্ত বেদনায় গোঙাচ্ছে। তার একটু তফাতে যে কটা লোক উবু হয়ে বসে রয়েছে তাদের মুখে কোনো সাড়া নেই, শুধু তারা নিঃশব্দে ধুঁকছে। আমু কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর আপন মনে থমকে ভাবল : ওদের সঙ্গে তার চেনা নেই, ওদের বেদনার সঙ্গে তার পরিচয় নেই, সে কেন যাবে তাদের কাছে! যাবে না। তারপর কেমন একটা চাপা ভয়ে সে যেন ভাঙা পা নিয়ে পালিয়ে চলল। কী যে সে-ভয় সে-কথা সে স্পষ্ট বলতে পারবে না, এবং সে-কথা জানবারও কোনো তাগিদ নেই, শুধু-যে কেমন একটা ভয় কালো ছায়াচ্ছন্ন করে তুলেছে তার সারা অন্তর, সে-ভয় হতে মুক্তি পাবার জন্যে সে পালিয়ে যাবে সে-রাস্তা দিয়েই, যে-রাস্তার কোনো শেষ নেই। যে-ছায়া ঘনিয়েছে মনে, তারও কি শেষ নেই? আর, সে-ছায়া কি মৃত্যুর?

অনেকক্ষণ পর তার খেয়াল হল যে একটা বন্ধ-দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, আর তার গলার সুড়ঙ্গ দিয়ে একটা আর্তনাদ বেয়ে-বেয়ে উঠছে ওপরের পানে, এবং যখন সে-আর্তনাদ শূন্যতায় মুক্তি পেল, রাত্রির বিপুল অন্ধকারে মুক্তি পেল, অত্যন্ত বীভৎস ও ভয়ঙ্কর শোনাল তা। এ কি তার গলা—তার আর্তনাদ? সে কি উন্মাদ হয়ে উঠেছে? অথবা কোনো দানো কি ঘর নিয়েছে তার মধ্যে? তবু, তবু, তার মনের প্রশ্নকে উপেক্ষা করে সুড়ঙ্গের মতো গলা বেয়ে তীক্ষ্ণ তীব্র বীভৎস আর্তনাদের পর আর্তনাদ বেরিয়ে আসতে লাগল, আর সে থরথর করে কাঁপতে লাগল আপাদমস্তক। অবশেষে দরজার প্রাণ কাঁপল, কে একটা মেয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এল, এসে অতি আস্তে-আস্তে অতি শান্তগলায় শুধু বলল : নাও।

কী? কী সে নেবে? ভাত নেবে। ভাতই কি সে চায়? সে ভাতই চায়; এ-দুনিয়ায় চাইবার হয়তো আরো অনেক কিছু আছে, কিন্তু তাদের নাম সে জানে না। ত্রস্তভঙ্গিতে ময়লা কাপড়ের প্রান্ত মেলে ধরে সে ভাতটুকু নিলে, নিয়ে মুখ তুলে কয়েক মুহূর্ত নিষ্পলক চোখে চেয়ে রইল মেয়েটির পানে। মনে হচ্ছে

যেন চেনা-চেনা। না হলে সে চোখ ফেরাতে পারবে না কেন।

—নয়নচারা গাঁয়ে কি মায়ের বাড়ি?

মেয়েটি কোনো উত্তর দিল না। শুধু একটু বিস্ময় নিয়ে কয়েক মুহূর্ত তার পানে চেয়ে থেকে দরজা বন্ধ করে দিলে।

চিরায়ত গ্রন্থমালা

এবং

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়
বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ
ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে
পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
এই বইটি **'চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা'**র
অন্তর্ভুক্ত।
বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র